রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ SUPPLI

রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

সাহিত্যের সঙ্গে আরও কিছু...

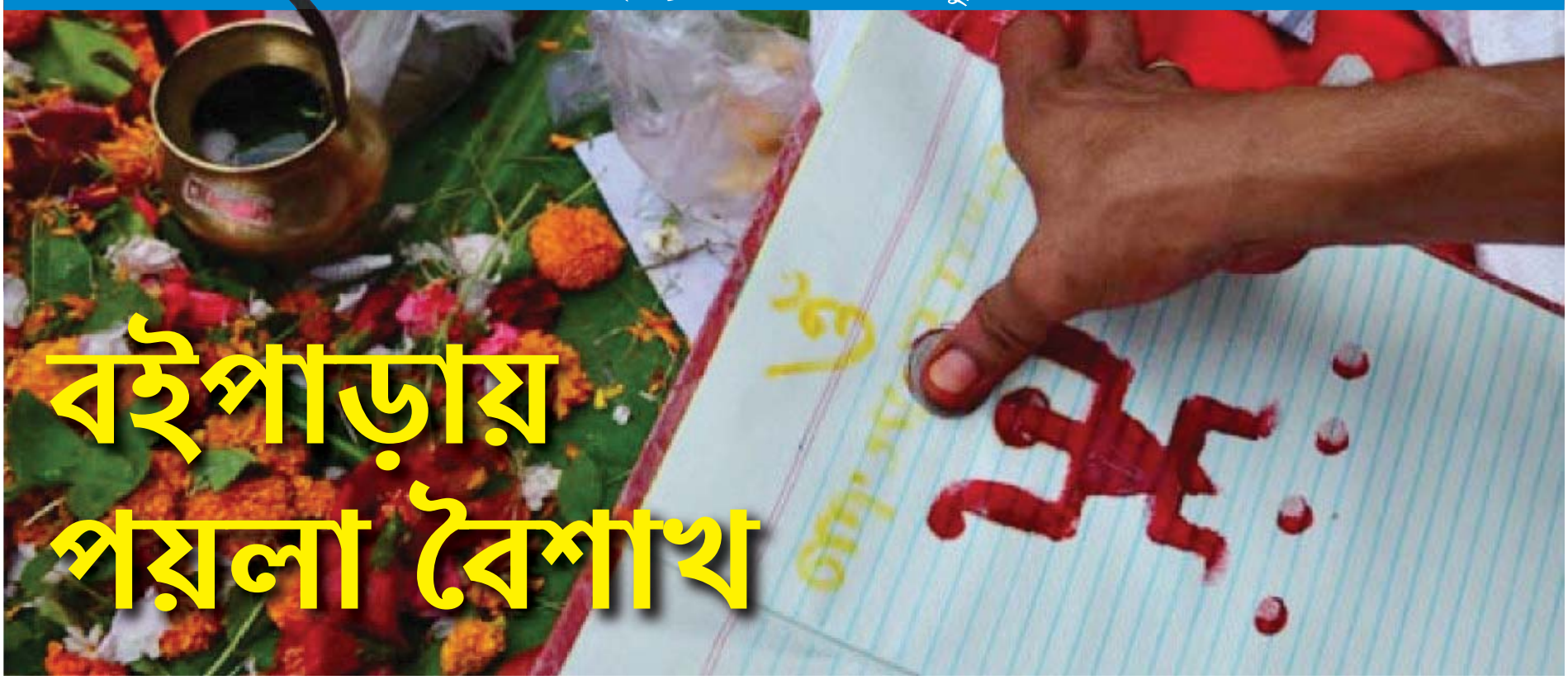

বইপাড়ায় পয়লা বৈশাখ

সৈকত ঘোষ

বাঙালির বারো মাসে তেরো নয়, বাহান্ন পার্বণ। আর বৈশাখ মানে বছর শুরু, তাই এর উন্মাদনাই আলাদা। সবচেয়ে বড় কথা আজও পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালির কাছে একটা অন্যরকম আবেগ। কথায় বলে, ইতিহাস জোনাকির মতো মিলিয়েও মেলাতে চায় না, অন্ধকারে জ্বলে ওঠে। আসলে বাঙালি মুখে যাই বলুক না কেন, বাংলার আবহমান কালের সংস্কৃতিকে আজও যত্ন করে আগলে রেখেছে কোনও এক অদৃশ্য সুতোর বাঁধন। আর বিশেষ দিনগুলোতে তো বাঙালির বাঙালিয়ানা আরও বেশি করে জেগে ওঠে। এই দিনটাতে অন্যান্য ট্র্যাডিশনের মতোই বাঙালির বইপাড়ার নববর্ষ উদ্‌যাপনের ট্র্যাডিশন কিন্তু ইতিহাসে বেশ গৌরবজ্জ্বল।

সে একটা সময় ছিল যখন পয়লা বৈশাখ মানে লেখকদের জামাইষষ্ঠী। সময়টা আজ থেকে কয়েক দশক আগে। কলেজ স্ট্রিট চত্বর মানে, বইপাড়ায় একটা উৎসব উৎসব গন্ধ। প্রতিটা প্রকাশকের ঘরেই উপচে পড়া ভিড় আর তার মাঝেই চলছে বই অনুরাগীদের দেদার সই শিকার। শুভ মহরৎ উপলক্ষে প্রকাশকদের তরফ থেকে লেখকদের জন্য থাকত জামাই আদরের ব্যবস্থা। ডাবের শরবৎ থেকে স্পেশাল রাজভোগ, রসমালাই থেকে মটন কবিরাজি, জার্মান কফি থেকে সুইডিশ কুকিজ কী থাকত না মেনুতে! আর বাড়তি পাওনা হিসাবে পানাশক্তদের জন্য থাকতো সাহেবি আয়োজন। আর এই দিনেই তো প্রকাশকরা লেখকদের হাতে তুলে দিতেন বইয়ের রয়্যালটির চেক। বেশিরভাগ লেখক তাঁর নতুন বই প্রকাশের জন্য বেছে নিতেন এই বিশেষ দিনটিকে। এ যেন এক মহাযজ্ঞ, পাঠক-লেখক মহাসমাবেশ। দোকানের বাইরে বইয়ের জন্য রীতিমতো লাইন, এমনকী কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এই অমুকের ঘরে বিমল মিত্র বসেছেন তো আর এক জায়গায় হট ফেভারিট সমরেশ বসু। পাটভাঙা নতুন পাঞ্জাবি ঘাড়ে পাউডার গায়ে আতর ছড়িয়ে লেখকরা হাজির হতেন দুপুর দুপুর। বইপাড়া জুড়ে তখন চাঁদের হাট। উৎসব চলত প্রায় রাত অবধি। বই বিক্রির নিরিখেও সেই সময়টাকে বাংলা বইয়ের স্বর্ণযুগ বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

সাতের দশকের শেষ থেকেই ধীরে ধীরে ট্রেন্ড ঘুরতে শুরু করে। কমে আসে পয়লা বৈশাখের জৌলুস। আন্তরিকতার জায়গায় ঢুকে পরে কৃত্রিমতা। গ্লোবলাইজেশনের ছোঁয়ায় বদলে যেতে শুরু করে বাঙালির রুচি। ততদিনে বাজারে এসে গেছে হাজার একটা নতুন উপকরণ। বইপোকা বাঙালির পছন্দের তালিকায় উপরের দিকে উঠে আসছে গান এবং সিনেমা। বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট পরিবর্তন চলে এসেছে। বদলে যাচ্ছে পছন্দের উপকরণগুলো।

এবার এই পরিবর্তনের আবহমানতায় একটু এই সময়ে ফিরে আসা যাক। বইপাড়ায় আজকের পয়লা বৈশাখ ঠিক কেমন— সবই কি শেষ, কিছুই কি আর নেই বাকি? শুধু একঝাঁক নস্টালজিয়া আঁকড়ে বসে আছি আমরা? না, ব্যাপারটা কিন্তু পরোপুরি তা নয়। সেই সময় আর এই সময়ের তুলনামূলক বিচার করলে বলতে হবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সবকিছু বদলে গেছে ঠিক-তেমনি পয়লা বৈশাখের আঙ্গিকটাও অনেকটা বদলে গেছে। এখন উন্মাদনায় খানিকটা ভাঁটা পড়েছে। তবু এখনও নতুন বছরে বইপাড়া সেজে ওঠে। বেশ কিছু প্রকাশক কোনওরকমে অবশ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন এই ট্র্যাডিশন। এখনও লেখকরা আসেন প্রকাশকদের ঘরে। তবে নতুন বই বেরোনোর সংখ্যাটা অনেকগুণ কমে গেছে পয়লা বৈশাখে। বইমেলা এখন মেগা ইভেন্ট, বছরে সবচেয়ে বেশি নতুন বইপ্রকাশ পায় বইমেলায়। আর তাই ধারে ও ভারে পয়লা বৈশাখের প্রায় সত্তর লাইমলাইট গিলে নিয়েছে কলকাতা বইমেলা।

কিছুটা স্থিমিত হয়ে গেলেও আজকের পয়লা বৈশাখেও বইপাড়ায় উৎসব হয়। জমে ওঠে আড্ডা। খাওয়া-দাওয়া। লেখক-পাঠক সমাবেশ। আর তার সঙ্গে অবশ্য আজকের নবতম সংযোজন সেলফি পর্ব। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের যুগে এখন সই-এর চেয়ে ছবির কদর বেশি। পাঠক পছন্দের লেখকের বইও কেনেন। পরিসংখ্যানগতভাবে এই বিশেষ দিনটিতে হয়তো বই বিক্রির সংখ্যা কিছুটা কমে গেছে যেহেতু মানুষ এখন সারা বছর বই কেনেন।

অনেক পুরনো দিনের মানুষই বলেন, আজকের পয়লা বৈশাখ নাকি অতীতের ছায়ামাত্র। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই উন্মাদনা অনেকটাই ম্লান। কোথাও একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। আসলে অ্যাভেলেবিলিটির যুগে লেখকরা আজ আর ভিনগ্রহের জীব নন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠক খুব সহজেই তাঁর প্রিয় লেখককে পেয়ে যান। যার ফলে সেই ক্রেজ আজ অনেকটাই কমে গেছে। এক সময় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহেশ্বেতা দেবী প্রমুখকে দেখার জন্য পয়লা বৈশাখ মানুষ বইপাড়ায় ছুটে যেত। এখন যেহেতু প্রিয় লেখককে অনেক সহজেই দেখা যায় বা তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, তাই সেই উন্মাদনা একটু ভাগ হয়ে গেছে।

একটা সময় ছিল যখন পুজোতে নতুন জামা আর পয়লা বৈশাখে নতুন বই— এটাই ছিল বাঙালি রেওয়াজ। মানুষ আগে থেকে লিস্ট করে রাখতেন তাঁর পছন্দের বইয়ের। এইদিন পাওয়া যেত বিশেষ ডিসকাউন্ট। যার ফলে দোকানে দোকানে লম্বা লাইন ছিল সাধারণ দৃশ্য। বই বিক্রি ও উন্মাদনার বিচারে ক্যালকুলেশন করা হতো লেখকের স্টার ভ্যালু। বইপ্রকাশ উপলক্ষে প্রকাশকরা রাখতেন বিভিন্ন ইভেন্ট। সেটা অবশ্য এখনও হয়। এই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রোমোশন এবং মার্কেটিংয়ের ধরণটা বদলে গেছে।

লেখকদের ঘিরে সেই উন্মাদনা, প্রকাশকদের সেই জামাই আদরের তৎপরতা কোথাও যেন ফিকে হয়ে গেছে এখন। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে প্রকাশকরা কি লেখকদের কম গুরুত্ব দিচ্ছেন? নাকি লেখকরা সেই মানের লেখা লিখতে পারছেন না, যা সাধারণ পাঠককে বইয়ের জন্য উন্মুখ করে রাখবে? প্রকাশকদের দিকে আঙুল ওঠা বা লেখকদের লেখা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আজ বাতুলতা। পয়লা বৈশাখ শব্দটাই বাঙালির মন ভালো করার উপকরণ। যাইহোক তবে এটা তো বলতেই হবে বইপাড়ার পয়লা বৈশাখ আজও তার গ্ল্যামার ধরে রেখেছে, বাস্তবে না হলেও নস্টালজিয়ায় তো বটেই...

অন্য পাতায়: প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, স্পেশাল কলাম, আত্মজীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা, রাশিফল

রবিবারের বই
যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

কথায় কথায়

পয়লা বৈশাখ, নতুন বইপ্রকাশ ও বই বিক্রি

এখন অবশ্য পয়লা বৈশাখে খুব বেশি নতুন বইপ্রকাশ হয় না। তবে এখনও বৈশাখের প্রথম দিন লেখকরা আসেন প্রকাশকদের আমন্ত্রণে। তখন আর এখনকার নতুন বইপ্রকাশ, প্রকাশকদের আথিথেয়তা, বইয়ের বিক্রি-সহ সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে বললেন দুই প্রবীণ সাহিত্যিক।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পয়লা বৈশাখে বইপাড়ায় লেখক, কবি, পাঠক সকলের মধ্যে একটা মেলবন্ধন দেখা যায়। এদিন লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা আড্ডার পরিবেশ লক্ষ করা যায়। সেখানে কথাবার্তা, গল্প, আড্ডা, মিষ্টিমুখ হয়। এইদিন মন্তব্য লেখার জন্য একটি খাতাও রাখা থাকে প্রকাশকদের ঘরে। এক-একরকম প্রকাশক এক-এক ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। আগের চেয়ে এখন বইপাড়ার পরিবেশ অবশ্য কিছুটা পালটেছে। পয়লা বৈশাখে এখন আর সেভাবে ঘটা করে খুব বেশি বইপ্রকাশ করা হয় না, করা হয় বইমেলায়। আর একটা ব্যাপার এই সময়ে একটা পরিবর্তনের কথা প্রকাশকদের মুখ থেকে খুব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হল বই বিক্রির কথা। বই বিক্রি কমেছে। আগে একটা বই ১১০০-১২০০ কপি ছাপা হতো, এখন সেখানে একটা বই ৫০০-৫৫০ কপি ছাপা হয়।

নলিনী বেরা

বইপাড়ায় পয়লা বৈশাখ ঘিরে আমরা প্রতি বছরই প্রকাশকদের ঘরে আমন্ত্রিত হয়ে থাকি। উৎসাহ বা আন্তরিকতা ৭০-এর দশকেও যেভাবে অনুভব করেছি আজও সেই একই আন্তরিকতা আছে। অগ্রজ লেখক

বলতে প্রফুল্ল রায়, দেবেশ রায়-এর মতো লেখকেরা আসেন, আবার আমার সমবয়সি বন্ধুরাও আসেন। সব মিলিয়ে একটা জমাটি আড্ডা হয়। এখনও ডাবের জল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়, তালশাঁসের মিষ্টি খাওয়ানো হয়।

তবে জনপ্রিয় বইগুলির বিক্রি কমেছে, কিন্তু সিরিয়াস সাহিত্যের বিক্রি বেড়েছে বলে মনে করি। আগে জনপ্রিয় বইয়ের পাঠক ছিল আমাদের ঘরের মেয়েরা। কিন্তু আজ তাঁরা টিভিতে সিরিয়াল দেখায় বেশি ব্যস্ত। আবার টিভি সিরিয়ালের মাধ্যমে কোনও গল্প খুব পপুলার হলে তখন তারা সেটা কিনে পড়ে। আগে কোনও সাহিত্যসভায় নিমন্ত্রিত হলে বই উপহার দেওয়া হতো, এখন তার বদলে বেডশিট, বেডকভার এইসব দেওয়া হয়।

*কথা বলেছেন **বিপাশা চক্রবর্তী***

বিশেষ নিবন্ধ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক উজ্জ্বল সাহিত্য জ্যোতিষ্ক প্রোমোদিয়া অনন্ত তোয়ের

কৌশিক রায়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত এবং প্রাচীন ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সঞ্জীবিত রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার নাম শুনলেই মনে আসে অতুলনীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র। বোর্নিও এবং সারাওয়াক দ্বীপের অরণ্যানী, জাভাদ্বীপের একদা অগ্নিস্রাবী ক্রাবাতোয়া পাহাড় এবং বরোবুদুরের স্তূপ নামক অসাধারণ ধর্মীয় স্থাপত্য নিদর্শন অন্যতম আকর্ষণ এখানকার। সুবার্নো, জেনারেল সুহার্তো এবং প্রিন্স নারোদম সিহানুক-এর মতো নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি এবং অবশ্যই রুডি হারতোনো, লিয়েম স্যুই কিং এবং ধানি সারতিকা-র মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাডমিন্টন তারকাদের নাম জুড়ে আছে যে-দেশের সঙ্গে, তার নামই ইন্দোনেশিয়ার। তবে একদা বিদেশি মহাশক্তিগুলির দ্বারা উপনিবেশে পরিণত হওয়া ইন্দোনেশিয়াতে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সুপ্ত সাহিত্যকৃতিরও বিকাশ ঘটেছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, মানবতাবাদের লঙ্ঘন, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, লিঙ্গবৈষম্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই দ্বীপ রাষ্ট্রের বহু সাহসী ও দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ক্রোশফলক হয়ে রয়েছেন প্রোমোদিয়া অনন্ত তোয়ের।

ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে কলম ধরেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, ইন্দোনেশিয়ার বুদ্ধিজীবি সমাজে 'প্রম' নামে সুপরিচিত প্রমোদিয়া অনন্ত তোয়ের। কিউবার কবি হোসে মার্তি-র লেখনীতে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল স্পেনীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ, নাইজেরীয় কবি-

খেউ সাম্পান-এর মতো স্বৈরাচারীদের নেতৃত্বে। বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে, কাম্বোডিয়ার জনগণের ওপর অনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া এই একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদ করেন প্রোমোদিয়া। এর জন্য, পল পট-এর ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে তাঁর প্রাণ সংশয়ও হয়েছিল। প্রোমোদিয়া-র রচনাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রজন্মের দুই লেখক— মোখ্তার ল্যুবিস এবং গোয়েনাওয়ান মোহাম্মেদ।

রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রোমোদিয়া বিশ্বাস করতেন এক বিশ্বজনীন আত্মিক স্বাধীনতায়- 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য/উচ্চ যেথা শির/জ্ঞান যেথা মুক্ত...।' সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য প্রোমোদিয়া অনন্ত তোয়ের-এর নাম বহুবার বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, সোভিয়েত সাহিত্য শিখর কাউন্ট লিও তলস্তয়ের মতোই খারিজ হয়ে গেছে। হয়তো, সমাজের ধনাঢ্য, সুবিধাভোগী মানুষদের উন্নাসিকতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি বলেই প্রোমোদিয়াকে বিশ্ব সাহিত্যের অন্তরমহলে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

বেনজামিন মোলোয়েজ কাব্যে যেভাবে উদ্গীরিত হয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তেমনি প্রোমোদিয়া অনন্ত-র লেখনীতে ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠে আসে। এর জন্য ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত, শ্বেতাঙ্গ শাসকের নিষ্ঠুর রায়ে দফায় দফায় কারাবাসও হয় প্রোমোদিয়ার। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার প্রতিটি সড়কে, প্রতিষ্ঠানে প্রোমোদিয়ার মুক্তির জন্য প্রবল গণ-আন্দোলন শুরু হয়। শাসকের অত্যাচারে প্রায় বধির হয়ে যান এই সাম্রাজ্যবাদী, গণ-সংগ্রামের আপোসহীন লেখক। তাঁর অনেক অমূল্য রচনার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়েও দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয় রাষ্ট্রপ্রধান সুকার্নোর একনায়কত্বকে থামিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় অস্থির, স্বদেশীয় রাজনৈতিক ধর্মসংকটকে উপজীব্য করেই প্রোমোদিয়া অনন্ত তোয়ের লেখেন তাঁর মহাকাব্যচিত উপন্যাস 'দ্য ব্যুরু কোয়ার্ট্রেট'। বামপন্থা এবং সমাজতন্ত্রবাদের বিচারে এই উপন্যাসটিকে নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি-র 'ইস্পাত', জন গলস ওয়ার্দির নাটক 'স্ট্রাইক' এবং জন স্টেইনবেক-এর 'দ্য গ্রেপ্স্ অব রাথ্' উপন্যাসটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বইটিতে ভাগ্যান্বেষণের জন্য ইন্দোনেশিয়াতে এসে এবং বসবাস করে প্রতারিত জাভানিজ, ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, পুনান এবং ডিয়াক আদিম জনজাতির মানবজমিনের এক অপূর্ব নকশিকাঁথা বুনেছেন প্রোমোদিয়া। বইটিতে বিমূর্ত, পরাধীনতার যন্ত্রণার সংবেদনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে গেছে প্রোমোদিয়া-র আত্মকথন— 'আ মিউট'স সোলিলোকী' (মূকের স্বগতোক্তি) – তে বর্ণিত ইন্দোনেশিয়ার একটি নির্জন দ্বীপে তাঁর ১৪ বছরের শ্রম-নির্বাসনের মর্মস্পর্শী বিবরণ।

স্বৈর শাসকের অত্যাচার সহ্য করেও আত্মপ্রত্যয়ে অটল, 'দ্য ব্যুরু কোয়ার্ট্রেট'-এর প্রধান চরিত্র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তাবাদী রাদেন মাস মিনকে-র সঙ্গে অনেকটাই মিল পাওয়া যায় হাঙ্গেরীয় লেখক আর্থার কোয়েসলার-এর 'ডার্কনেস অ্যাট নুন' উপন্যাসের নিকোলাস সালমানোভিচ রুবাশোভ এবং জার্মান বাম সক্রিয়তাবাদী লাইবনিখ্ট-এর জীবন। 'দ্য ব্যুরু কোয়ার্ট্রেট', ইন্দোনেশিয়াতে ডাচ স্বৈরাতন্ত্রের বুনিয়াদে জোরালো আঘাত করে। বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের একজন আধিকারিক। তাঁকে ডাচ প্রশাসনের চাপে পড়ে ইস্তফা দিতে হয়। ঘটনাটির সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর মাইকেল মধুসূদন কৃত ইংরেজ অনুবাদের প্রকাশনাতে অর্থ সাহায্য করা পাদ্রী জেমস্ লং-এর কারাবাসের তুলনা করা যেতে পারে।

প্রোমোদিয়া বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন ইন্দোনেশিয়াতে ঘন ঘন সরকার পালটানো এবং জেনারেল সুহার্তো, সুকার্ণো-পুত্রী, বাহিরুদ্দিন হাবিবি-র মতো রাষ্ট্রপ্রধানদের একনায়কোচিত কার্যকলাপে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে যেমন ভিয়েতনামে জেনারেল নস্তয়েন ভ্যান জিয়াপ, সিঙ্গাপুরে লি কোয়ান ইয়ু, মহাচিনে দেংজিয়াওপিং, ফিলিপাইনসে ফার্দিনান্দ মার্কোস ও জোসেফ এস্ত্রাদার মতো স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে জন প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন প্রোমোদিয়া অনন্ত তোয়ের। কাম্বোডিয়ার (পূর্বতন কাম্পুচিয়া) 'খেমের রুজ'' নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, শিল্প-সংস্কৃতি-বাণিজ্যের কাঠামো বিধ্বস্ত করে একটি আদিম, অনগ্রসর, কৃষিপ্রধান, বিচ্ছিন্ন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিল পল পট এবং

রবিবারের বেঙ্গল

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

ফি রে দে খা

রেডিও একসময় সম্মোহিত করে রাখত বাঙালিকে

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের দিনে যদি কেউ বলে, পোস্টঅফিসে যেতে হবে রেডিওর ট্যাক্স জমা দিতে, তাহলে এখনকার প্রজন্ম সেটা কীভাবে নেবে? রেডিওর জন্য ট্যাক্স! হ্যাঁ, সে-যুগে রেডিওর জন্যও ট্যাক্স দিতে হতো। সারা বছরে পনেরো টাকার মতো। রেডিও তো তখন মানুষের যাপিত জীবনে এক অত্যন্ত আপনজন, বাঙালির রোম্যান্টিসিজমের অনন্য ধারক। শীতের উঠোনবেলায় বা গ্রীষ্মের গৃহকোণে, রেডিও তখন স্বর্ণযুগের আলোয় উজ্জ্বল। লোকাল মেড-এর পাশাপাশি 'মার্ফি', 'বুশ', 'ফিলিপস' ইত্যাদি ব্র্যান্ডের রেডিওর বাজার তখন জমজমাট।

এখন টাচস্ক্রিন আর ইয়ারপ্লাগ গুঁজে গান শোনার জমানায় রেডিওর সে আভিজাত্য আর নেই। কারও বাড়িতে এখনও চালু কোনও রেডিও সেট দেখলে সকৌতুক প্রশ্ন আসে, রেডিওটি কি সত্যিই চলে? কিন্তু ইন্টারনেট, মোবাইল, ইউটিউব, ডাউনলোড ইত্যাদি শব্দগুলি যখন কল্পনাতেও ছিল না, তখন রেডিয়োই ছিল নয়নের মণি। কাঠের বড় বাক্স-সেটটির সঙ্গে তারের মাধ্যমে ঘরের ভিতর বা ছাদে জুড়ে থাকত একটি ফিতের মতো চওড়া এরিয়াল বা অ্যান্টেনা। পরের দিকে ছোট ট্রানজিস্টার সেট রেডিওতে আর ওই ফিতের মতো অ্যান্টেনা থাকত না। তখন বিশাল পৃথিবীটা সামনে এসে যেত এই রেডিওর মধ্যে দিয়েই। প্রথমদিকে রেডিও স্টেশনের নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'। পরে ১৯৫৬ থেকে নাম হয় 'আকাশবাণী'। অনুষ্ঠান শুরু হতো সকাল ছ'টায়, মনমাতানো সেই অপূর্ব সুর শুনিয়ে। এখন যারা বয়স্ক, তাঁদের কাছে রেডিও মানে ছিল সকালে দেশাত্মবোধক গানের স্পিরিটে নিজেদের সতেজ করা, পার্থ ঘোষের 'গল্প দাদুর আসর' আর ইন্দিরাদির 'শিশুমহল' শুনে সীমাহীন ভালোলাগা আর কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া। দুপুরে একক বা দ্বৈতশিল্পীর গানের আধঘণ্টার অনুষ্ঠান 'গীতিকা', বিভিন্ন শিল্পীর গানের 'অনুরোধের আসর' আর 'ছায়াছবির গান'-এর মতো অনুষ্ঠানগুলি ছিল সুপার ডুপার হিট। শ্রোতারা এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে স্বর্ণযুগের বাংলা আধুনিক গানকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন জীবনে, মননে। আর বাংলা নাটক? রেডিওর সে এক মস্ত বড় আকর্ষণ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন এই বিভাগটির একজন রূপকার। অনেকের কাছেই সেই সময়টা ছিল এক রোমাঞ্চের দিনযাপন। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ সময়ে 'নাটক'-এর জন্য সেই অপেক্ষা সার্থক হয়ে উঠত নাটকটি শোনার পর। সেই শ্রুতিনাটকগুলিতে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, জগন্নাথ, ঊর্মিমালা, রুদ্রপ্রসাদ, অজিতেশ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের ম্যাজিক কণ্ঠের অভিনয় শ্রোতাদের নিয়ে যেত এক মোহময় কল্পনার জগতে। মহিলাদের জন্য বেলা দি'র 'মহিলা মহল' ছিল ঘরকন্নার টুকিটাকির মস্ত রিসোর্স। আর রবিবারের সকালে পঙ্কজ মল্লিকের 'সংগীত শিক্ষার আসর' শুনে কত শিল্পীই না গান শিখে নিয়েছেন সবার অজান্তে!

এই অনুষ্ঠানগুলি সবই কলকাতা 'ক'-এর সম্প্রচার। সেখানে তখন ছিল না কোনও বিজ্ঞাপনের বালাই। সে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। কলকাতা 'খ' থেকে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সালে। অসম্ভব জনপ্রিয় সেই অনুষ্ঠান থেকে কান ফেরানো যেত না। হিন্দিতে বিনাকা গীতমালা তো ছিলই। আর তুমুল ভালোবাসার ছিল সারাদিন ভারতীয় সংগীত বেজে চলা 'রেডিও সিলোন'। অনেকে ভুল উচ্চারণে বলত রেডিও শিলং। যদিও শর্ট ওয়েভের অনেক সেন্টারের ভিড়ে সেটিকে একটু চেষ্টা করেই ধরতে হতো। যে রেডিওতে সিলোন ধরত না, তার তেমন আদর ছিল না যুবসমাজের কাছে।

কলকাতা 'ক'-এর আর একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল বাংলা সংবাদ যার শুরু হয়েছিল সুদূর ১৯৩৩ সালে। দিল্লি থেকে রিলে হয়ে আসা বাংলা সংবাদ পাঠে নীলিমা স্যান্যাল, ইভা নাগদের সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর আর স্থানীয় সংবাদে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাত্ত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ সংবাদ পাঠকদের অনন্য

স্টাইল বাঙালির চেতনাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল অনেককাল। আর ছিল গ্রীষ্ম-বর্ষায় ফুটবল খেলা আর শীতকালে টেস্ট ক্রিকেটের ধারা বিবরণী। সে এক অত্যাশ্চর্য চিত্ররূপ, যেন ঘরের উঠোনে চোখের সমানে খেলা হচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমেই সেই ছবি ভেসে আসত অজয় বসু, পুষ্পেন সরকার, কমল ভট্টাচার্যদের অসাধারণ বাচনভঙ্গির গুণে।

সেই সময় রেডিও ছিল যেন বড় হয়ে যাওয়ার একটা দরজা। মানুষের নিত্যসঙ্গী, তা ঘরে হোক বা বাইরে, চায়ের দোকানে, কৃষকের ঘরে বা দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের নৌকায়। সবার বাড়িতে অবশ্য রেডিও ছিল না। যাদের ছিল, তাদের বাড়িতে আসত প্রতিবেশীরা। খবর বা খেলা শুনতে বা মহালয়ার ভোরে। সে ছিল এক সামাজিক মেলবন্ধন। জনপ্রিয় বাংলা সিনেমাতেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। আর মহালয়ার আগে তো রেডিও সারানোর ধুম পড়ে যেত। আসলে খবরে, খেলায়, গানে, নাটকে রেডিওকে আঁকড়ে ধরে বাঙালি সেই সময় তার বিনোদন উদ্‌যাপন করত অসীম আনন্দে। ক্রমশ কালের নিয়মে হারিয়ে যায় অনেক কিছু। রেডিও গেছে, আজকের দিনে রেডিও বিক্রির বা সারানোর একটি দোকানের দেখা মেলাও ভার।

বিশেষ কারণবশত এই সপ্তাহে ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশ করা হল না। আগামী সপ্তাহ থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে এই দুটি লেখা।

আ ড়া ল থে কে

পহেলা নেশা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

আবার পহেলা নেশা। বাঙালির বৈশাখ বিলাস। কী পেয়েছি আর কী যে পেলাম ভাববার অবকাশ নেই।

একদিকে রাজনীতির রঙ্গ। পহেলা উত্তেজনার পারদ তুমুলে। অন্যদিকে তাপমাত্রার পারদ চড়চড় করে উঠছে সেই ভয়ে কুপোকাত বাঙালি। তবুও বিরিয়ানি, পোলাও-কালিয়া, কোর্মা, পটলের দোলমা, নতুন জামা, নতুন ছবি, নতুন ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ, সিডি রিলিজ, বর্ষবরণের ঢালাও আয়োজন। বৈশাখের আগমনী আর চৈত্রের স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে আবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর রিহার্সাল। কেন বাপু কাজকম্ম নেই? পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। মঞ্চ প্রস্তুত। শিল্পীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রোগ্রাম। নামীদামি শিল্পীকে পার্টি ফান্ড থেকে সাম্মানিক দেওয়া হয় অবশ্যি। ছোট ছোট ম্যাগাজিনের বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রকাশেও তাই। কিছু লেখক নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখবেন বলে কিনছেন। কী জ্বালা!

আর আছে অকাল বোশেখির হঠাৎ মেঘ কিংবা কালবৈশাখীর পরিকল্পনা। সেটা অবিশ্যি ওপরওয়ালার। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে বানভাসি বৈশাখ বিলাস বেল-জুঁই-এর গন্ধে ভরপুর। বর্ষবরণ বা বৈশাখ-উৎসব চৌপাট তখন। যত্তসব!

আমরা বাপু নববর্ষের শুভ মহরত বুঝি নতুন খাওয়া-দাওয়ায়। বাঙালির ঝালিয়ে নেওয়ার পালা সেই চিরাচরিত বং-কানেকশন। যতই ইংরেজি ছবি দেখি, ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে অনর্গল কথা বলি আর গোগ্রাসে কন্টিনেন্টাল খাবারদাবার গিলি না কেন, আদতে আমরা ঝোল-ঝাল-অম্বলের ভক্ত।

আমারা যেমন নিউইয়ারে কেকও কাটি, দোলে ঠান্ডাইতেও চুমুক দিই আবার পহেলা বৈশাখে কবজি ডুবিয়ে বাঙালি খানা খাই। এ বোধহয় আমাদের মতো হুজুগে বাঙালির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু হুজুগই কি শেষ কথা বাঙালির?

সেই পয়লা বৈশাখের দিন বাবার সঙ্গে দোকানের হালখাতার চিঠি নিয়ে, বরফকুচি দেওয়া কাচের গ্লাস উপচোনো অরেঞ্জ স্কোয়াশ আর বগলদাবা করে মিষ্টির বাক্স নিয়ে ফেরা? ঠাকুমার জন্য নিয়ে যেতে হবে সোনার গয়নার দোকানে নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার। দিদিমার জন্য বুকস্টল থেকে নতুন পঞ্জিকা। সবচেয়ে মজা লাগত মাছের বাজারেও হালখাতার মৌরসী পাট্টা দেখে। সেদিন মাছবাজার ধুয়ে-মুছে সাফ এক্কেবারে। লক্ষ্মী-গণেশের একযোগে পুজোয় মাছের আঁশটে গন্ধ কাটানোর জন্যে ফিনাইল, ধূপ-ধুনো। আর মাছওয়ালাও ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে বসেছে জম্পেশ করে। আমি বাবার হাত ধরে লেসের ফ্রিল দেওয়া, নতুন ছিটের নরম ফ্রকে। প্রথমবার গিয়ে ভেবেছিলাম সে বুঝি মাছ দেবে ফ্রি-তে। সে গুড়ে বালি! পয়লা নম্বর মিষ্টির বাক্স নিয়ে থরে থরে বসে আছে সে-ও। তার মানে বুঝলাম মিষ্টিমুখ না করলে বাঙালির শুভ কাজ হয় না। এই ছোটখাটো বাঙালিয়ানাগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে বহুযুগ ধরে। নিকুচি করেছে। এই নিয়েই পড়ে থাকল বাঙালি। শুধু ধুয়ে ধুয়ে জল খেল আর পেট ফোলাল।

রেস্তোরাঁয় বৈশাখী হেঁশেলের তোড়জোড়। মোচ্ছব সেখানেও। রসিক বাঙালির বৈশাখী রসনা বিলাস। শুরুতেই কাঁচা আমের জ্যুসের সঙ্গে ভদকার অভিনব ককটেল। অথবা তরমুজের লাল রসে পুদিনার সবুজ। ওপর থেকে আধ পেগ হোয়াইট রাম। যাকে বলে ফিউশন শরবত। তারপরেই লুচি, বেগুনভাজা, শাক-শুক্তো-ছ্যাঁচড়া-মুড়িঘন্ট। পরের দফায় ঘি ভাত, তপসে ফ্রাই। নির্গুণ, নির্গন্ধা বেগুন দিয়ে বেগুন বাসন্তী থেকে শুরু করে সারাবছর অচল পটলের দোলমা। ঘি-ভাতের কত রকম নাম হয় আজকাল! মোরগ পোলাও থেকে আফগানি জাফরানি মোতি পলান্ন। মানে পল অর্থাৎ মাংস মিশ্রিত অন্ন মানে যাকে বিরিয়ানি বলি আমরা। একই অঙ্গে ভাতের কত রূপ! সে কখনও দারুচিনি দেশে, কখনও মখমলি জুঁইফুলের বাগিচায়। মানে যাকে বলে সিনামন রাইস অথবা জেসমিন রাইস।

চিতলমাছের অনুকরণে গাছপাঁঠার মুইঠ্যা তো পনীর পসন্দ। যশুরে তেল কই কিংবা বরিশালি ইলিশ। কোথাও মৈথিলি ভেটকি, কোথাও আবার মটন মনোহরা। শুধু চমকে যাওয়া নামের অভিনবত্বে। আবার কোথাও মশলা মাখানো ভেটকি ফিলের পাতুড়ি কলাপাতায় আবার কোথাও লাউপাতায়।

বাঙালি রেস্তোরাঁগুলো এই একটা মাস ষোলো আনা বাঙালি। মধুরেণ সমাপয়েত ম্যাজিক মিহিদানার বেকড ভার্শন অথবা রসগোল্লার পুডিং দিয়ে। অথবা কোকো দিয়ে চোকোগোল্লার পাশাপাশি কফি গোল্লাও চলছে দিব্যি। এমন ইনোভেশনে আছে বাঙালি! সন্দেশের সঙ্গে ফ্রুট ফিউশনে কিংবা জলভরা জলপরী কিংবা দই-কলসের ঠান্ডা ছোঁয়ায়। মাটির ছোট্ট কলসে প্রথমে দই, তারপর মাখা সন্দেশ আর টপিং-এ গার্নিশ করা এক চামচ রাবড়ি। পেস্তা কুচিয়ে দাও ব্যস! অনবদ্য বং মিষ্টি। আর তারপরেও চালিয়ে দেওয়া যায় কেশরীয়া মালপোয়া কিংবা গুলাবি জিলিপিকে। রামকৃষ্ণদেবের কথায় ভরাপেটেও জিলিপি জিভ থেকে টুকুস করে, অতি অনায়াসে গলার মধ্যে দিয়ে সোজা পেটে চালান করা যায়। যেমন খুব ভিড়ে লাটসাহেবের গাড়ির চাকা ফাঁকফোকর দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে যায় সাবলীল গতিতে।

এসব রেস্তোরাঁয় খেতে যায় বহু মানুষ পয়লা বৈশাখে। আমাদের তো আসলে রোজ রোজ বৈশাখী। রোজ রোজ পয়লা নম্বর ভুরিভোজ চাই-ই। মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মতো বেঙ্গলি নিউইয়ার্স ডে আমাদের রোজ রোজ। বাকি যেটুকু করি সবটাই হুজুগে। তবে যাই বলুন, মিডিয়ার দৌলতে পয়লা বৈশাখের একটা দিব্যি ব্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেছে। সেটাই যা ভালোলাগার। গর্ববোধ করার। কিন্তু এসব আর কদ্দিন! উত্তিস্থিত জাগ্রত বাঙালি! বেলা বয়ে যায় যে!

এবারের বৈশাখী শ্লোগান ছিল নোট বাতিলের একবছর পর বাঙালির উত্থান। থুড়ি কেউ বলছে পতন। ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ডিজিটাল শপিংও করেছে বাঙালি। বৈশাখে খাদ্যবিলাসেও সামিল হয়েছে। আমিও হোমমেকারের হেঁশেলের চাক্কা বন্ধ করেছি পয়লা বৈশাখে। রাঁধছি না, রাঁধব না। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সব সঁপেছি পয়লা বৈশাখকে।

এসব তো ভালো কথা কিন্তু এবার নতুন বছরের পহেলা রেজলিউশন কি হবে জানেন কেউ?

রবিবারের চিঠি

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

নারী: কাল-আজ-কাল

পুরুষবিদ্বেষী নই, আমি পুরুষতন্ত্র-বিদ্বেষী

কৃষ্ণা বসু

একবার এক সাহিত্যসভায় আমাকে একজন সাহিত্যমনস্ক মানুষ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি পুরুষবিদ্বেষী?' আমি তাঁকে বলি, 'এই সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, মেয়েদের প্রতি, নারীজাতির প্রতি নানা অবিচার চলছে; লক্ষ লক্ষ কন্যাভ্রূণ হত্যা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শিশুকন্যাকে হত্যা করা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বধূ হত্যা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হচ্ছে— এইসব সত্য উচ্চারণ করলেই কি পুরুষবিদ্বেষী বলবেন? আমি পুরুষ-বিদ্বেষী নই, পুরুষতন্ত্র বিদ্বেষী আমি।'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে জানতে চেয়েছিলেন, আমার প্রিয় কয়েকজন পুরুষের নাম।

আমি তাঁকে জানাই অসংখ্য এরকম প্রিয় পুরুষ আছেন, সবচেয়ে প্রিয় পুরুষটির নাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রিয় পুরুষ— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, নজরুল ইসলাম— এরকম কত নাম বলব বলুন? পুরুষই আমার জন্মদাতা পিতা, পুরুষই আমার জীবনসঙ্গী, পুরুষ অসংখ্য প্রিয় পাঠক, পুরুষ প্রিয় ভাই, পুরুষ অসংখ্য প্রিয় ছাত্র— পুরুষ আমাদের শত্রু নন, পুরুষতন্ত্র আমাদের শত্রু।

মাঝে মধ্যেই এই প্রশ্নটির সামনে আমাকে পড়তে হয়, তাই আমি সবিনয়ে বিনম্র কণ্ঠে জানাই, 'পুরুষ আমার বন্ধু, বাবা, ভাই, জীবনসঙ্গী, ছাত্র, গুণমুগ্ধ পাঠক, সকলেই— এদের প্রতি আমার গভীর টান ও ভালোবাসা। এদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ কীভাবে আসতে পারে? কিন্তু পুরুষতন্ত্র? এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের মতো সংবেদনী মানুষের শত্রু, এই ব্যবস্থাটাকেই পালটাতে হবে। হবেই।'

এর উত্তরে হয়তো কেউ কেউ বলবেন, 'এই ব্যবস্থাকে পালটানো কি সম্ভব?'

এর শিকড় মাটির এত গভীরে প্রোথিত যে তা বলবার নয়। এখনও পুরুষমানুষ বিয়ে করে। মেয়েদের বিয়ে হয়। এখনও পিতার পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়! নারীরা এই সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক আজও।

আমি তাঁদের জানাই, 'যে মা নিজের জীবন বিপন্ন করে সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন, সেই মায়ের পদবি সন্তান বহন করে না, সেই সন্তান বহন করে পিতার পদবি।'

আবার এই প্রশ্নও জাগে মনে যে, তার মায়ের পদবিও মায়ের বাবার পদবি, পিতৃতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্তমান। এই পুরুষতন্ত্র, এই পিতৃতন্ত্র এত গভীরভাবে সমাজে বর্তমান যে এর থেকে বেরিয়ে আসা সত্যিই কঠিন, কঠিনতম ব্যাপার। আর এইসব সত্য আমার কলমে ফুটে উঠলেই আমার পরিচিত কেউ কেউ বলেন, 'আপনি নাকি পুরুষবিদ্বেষী।'

মানবসমাজে প্রকৃতির নিয়মে পঞ্চাশভাগ নারী, পঞ্চাশভাগ পুরুষ; এই ভারসাম্য আজ বিচলিত, ভারতীয় উপমহাদেশে একশত জন মানুষের মধ্যে ৫০ ভাগ পুরুষে ৪১ ভাগ নারী, প্রতি শতকে ৯ জন করে নারী নিহত হচ্ছে। তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে, এটি তো সমাজ-সত্য এই সত্যের যথাযথ উচ্চারণে পুরুষবিদ্বেষী হয়ে যাব আমি?

আমি, আমরা তো মানবতাবাদী, মানবতাবাদ-এর মধ্যে নারীবাদও তো আছে পূর্ণ পরিমাণে, সমাজের কাছে নিগৃহীত, নিষ্পেষিত যে নারী জাতি, তার কথা উচ্চারণ করলে পুরুষবিদ্বেষী বলা হবে কেন?

পুরুষতন্ত্রচালিত এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় সত্যগুলিকে, নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলিকে, নারীকে হেয় করার ঘটনাগুলিকে দেখতে ও দেখাতে গেলে তাকে কেন বলা হবে 'পুরুষবিদ্বেষ।' পুরুষতন্ত্র যে সমাজে সর্বত্র বিস্তারিত, প্রতি সামাজিক কাজকর্মে এই ব্যবস্থা যে তার থাবা বিস্তার করে বসে আছে, স্বচ্ছ বুদ্ধির মানুষ হলেই তা দেখা যাবে, শুধু দেখাই নয়, অনুভবও করা যাবে তীব্র ভাবেই।

ভ্র ম ণ ক থা

হারিয়ে যাওয়া চাবি

বীথি চট্টোপাধ্যায়

সেবার কাজের সূত্রেই দিল্লি গিয়েছিলাম। দিল্লি অধিবাসী কিছু বাঙালি মিলে একটি মাঝারি মাপের সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে আমি বেশ খুশি হয়েই দিল্লি পৌঁছে গেলাম। খুশির কারণ হল দিল্লি আমার বরাবরের প্রিয় শহর। বহুবার দিল্লি এসেছি এবং আরও বহুবার দিল্লি যেতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। দিল্লির মধ্যবিত্তর ভিতর একটা গভীর সচেতনতার বোধ আমি দেখি। যেমন কলকাতার হাটে-বাজারে-দোকানে দেখা যায় অজস্র টবের গাছ জল না-পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ তার্কিক বাঙালি মধ্যবিত্ত ভাবিই না টবগুলি দিয়ে নিজেদের আঙিনা সাজানোর পর গাছগুলিতে নিয়মিত জল দেওয়া, পরিচর্যা করাও আমাদের অবশ্য কর্তব্য। দিল্লিতে প্রতিবার দেখি টবের গাছগুলি সজীব, রাস্তার গাছপালায় যেখানে-সেখানে পেরেক মেরে প্ল্যাকেট লাগানোর অসভ্যতা নেই।

মানুষজন দেশের আইন, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। বড় বড় সামাজিক আন্দোলনের পটভূমি দিল্লি।

একটা সচেতন শহর বা গ্রাম অনেক বেশি সুন্দর হয়।

তাই দিল্লিতে এলে মনে একটা প্রসন্নতা কাজ করে আমার। তাছাড়া ইতিহাস খুব প্রিয় ছিল চিরকাল। সেজন্যেও দিল্লির ওপর টান আছে যথেষ্ট। আর আছে দিল্লির খাবার। পাঞ্জাবি খাবারের অতুলনীয় ঘরানাটি আরও মহানাগরিক হয়ে উঠেছে রাজধানীতে। দিল্লির রাস্তার ধারের ধাবায় রোটি মাখ্খানওয়ালা আর তন্দুর অথবা তড়কা; সে পুরোপুরি অমৃত।

সকালে হোটেলের ঘরে ঢুকে ভাবলাম একটু বিশ্রাম নিতে হবে। সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠান শেষ করে আমি একটু ঘুরে বেড়াব ঠিক করেছি। তাছাড়া রাজধানীতে আমার অজস্র বন্ধু-পরিচিত। তাঁদের সঙ্গেও সময় কাটাতে হবে।

এবারে এসেছি দু-দিনের জন্যে। উদ্যোক্তারা যে-বিলাসবহুল হোটেলে আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছেন সেই হোটেলটি দিল্লির খুব ফাঁকা জায়গায়। এই জায়গাটি আরও ঘন সবুজ। আটতলায় আমার ঘর। ঘর থেকে মানুষ নয়। গাছপালা আর পাখি দেখা যায় শুধু। হোটেলের ঘরে দরজা দিয়ে মনে হল ব্যবস্থাটি খুবই ভালো। হোটেলের ঘরে একা যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ কোনও মানুষের মুখ দেখব না বিষয়টি আমার ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। একা থাকলে নিজের সঙ্গে মাঝে মাঝে মুখোমুখি বসা যায়। অনেক না-মেটানো বোঝাপড়া, অনেক না-বলা কথা তখন উঠে আসে ভিতর থেকে।

হাত-মুখ ধুয়ে এক মাগ কফি করে নিয়ে বসলাম জানালার ধারে। আজকাল বেশিরভাগ হোটেলেরই জানালা খোলা যায় না। প্রমাণ সাইজের ফাইবার গ্লাসের পাশে ঘন সবুজ রাজধানী। হোটেলের লন। লনের মাঝখানে একটা সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। লনের ঘন সবুজ ঘাসের ওপর একটি তিনতলা সমান উঁচু নগ্নপরী। পরীটি কিন্তু শ্বেতপাথরের নয়। এই পরীটি কুচকুচে কালো। আর সেই কালো দিয়ে যেন মসৃণ আলো ঝলকাচ্ছে।

এই ঘরের আসবাবগুলিও ঝকঝক তকতকে হলেও পুরনো ধাঁচের। অ্যান্টিক সজ্জায় সাজানো ঘরটি। সেইজন্য আমার ঘরটিকে আরও ভালো লাগল।

একটু ঝিমুনি এসেছিল। নরম গদির বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল তখন বেলা তিনটে। বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলাম ঘুমের মধ্যে। দেখলাম আমি মারা গেছি। কে যেন আমার মৃতদেহটি টুকরো টুকরো করে কাটছে।

দুপুরে লাঞ্চ করিনি। একটু খিদে পাচ্ছিল।

পাঁচটায় আমাকে নিতে আসবেন উদ্যোক্তরা। হাতে দু-ঘণ্টা সময় রয়েছে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি দরজায় ঠকঠক শব্দ হল।

এরমধ্যেই খাবার হয়ে গেল। এই তো অর্ডার দিলাম এখুনি। দরজা খুলে দেখি সামনে একটি বছর কুড়ি-বাইশের মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চুল খোলা। পিন করে শাড়ি পরা। হোটেলের রিসেপশনে যেমন মেয়েরা পিন করে নীল শাড়ি পরে, তেমন করেই শাড়িটি পরেছে।

তার মানে হোটেলের কেউ হবে হয়তো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে এল। অবাক হলাম এবং বিরক্তবোধ করলাম।

এভাবে অতিথিকে না বলে কেউ ঘরে ঢুকে আসবে যে কোনও ভদ্র হোটেলে, এখন এটা অকল্পনীয় ঘটনা।

মেয়েটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে জানালার সামনে চলে গিয়েছে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এক্সকিউজ মি। মে আই আস্ক ইউ দ্যাট হোয়াই ডিড ইউ নক মাই ডোর? হ্যালো...'

মেয়েটি আমার দিকেঘুরে বলল, 'আপকি পাস রুম কি গলত চাবি আ গয়ি। মেরে রুম কি চাবি আপকি রুম পে চলে আয়ি।'

আমি অবাক। 'মুঝে তো মালুম নেহি। মেরি রুম নম্বর হ্যায় এইট জিরো জিরো। চাবি সে দরওজা খোল কেহি তো আয়া।'

মেয়েটি আমার ঘরের চাবিটা টেবিল থেকে তুলে হাতে নিল। 'সব চাবি সে দরওয়াজা খোল কে হি আতা হ্যায় ম্যাডাম। আয়ে হো চাবি সে খোল কে, যাওগে ক্যায়সে আপ?'

মেয়েটার মাথায় গণ্ডগোল আছে নাকি? আমি ওকে বললাম, 'তোমার ঘরের চাবি নিয়ে কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে তুমি রিসেপশনে বা রুম সার্ভিসে জানাও। আমার ঘরে তোমার চাবি চলে আসেনি। প্লিজ কল ট্যু রিশেপশন অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট নক মি ফর দিস রিজন।'

মেয়েটির চোখ-মুখ খুব থম থম করছিল প্রথম থেকেই। আমার কথা শুনে চাবিটা রেখে বেরিয়ে গেল। দরজা লক করে দিয়ে ভাবলাম কী উপদ্রব। কোনও মানে হয় এসবের। বেরোবার সময় রিসেপশনে বলে রাখতে হবে ঘটনাটা। কারণ দিনকাল ভালো নয়। একা হোটেলে থাকবার সময় সব বিষয়ে সতর্ক থাকাই ভালো।

পাঁচটা নাগাদ আমাকে অনুষ্ঠানের এক তরুণ উদ্যোক্তা নিতে এলেন। বেরোবার সময় রিসেপশনে ঘটনাটি জানিয়ে বললাম, 'আমি চাই এমন বিরক্তিকর ঘটনা আর যেন না ঘটে।'

রিসেশনিস্ট ছেলেটি দু-তিনবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে বলল, 'ডু ইউ ওয়ান্ট ট্যু চেঞ্জ দ্য রুম?'

আমি ঘর বদলাতে চাই না। অন্য ঘরে গেলে সেখানেও তো কেউ হুট করে ঢুকে পড়তে পারে।

তবু ছেলেটি বারবার বলতে লাগল যে আমি ঘর বদলে নিতে পারি।

আমি ঘর বদলাতে একেবারেই ইচ্ছুক নই। ঘরের জানালা দিয়ে একটা অশোক গাছ দেখা যায়। বসন্তের শেষে লাল ফুলে ভরে আছে গাছটা।

আমি অনুষ্ঠানের জন্যে বেরিয়ে গেলাম। অনুষ্ঠান হল আর আমার ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি একেবারেই হল না বাঙালি বন্ধুরা ধরে নিয়ে গেল তাঁদের বাড়িতে। অনেক রাত অবধি খাওয়া-দাওয়া গল্প চলল। যে-বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা হচ্ছিল সে রাতটা তার বাড়িতেই থেকে যেতে অনুরোধ করল অনেকবার। কিন্তু আমার ঘরে আমার ওষুধ আছে, জামাকাপড় আছে তাই হোটেলেই ফিরতে হল আমাকে।

ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে ঘরের একটা চাবি ক্রাশ করে আলো জ্বালালাম। আলো জ্বলতেই আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ঘরে বসে আছে সেই চুল খোলা নীল শাড়ির মেয়েটি। আমার কথা হারিয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপর ফুঁসে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমার ঘরে কেন ঢুকেছ? এখুনি আমি হোটেলে বলছি, দরকারে পুলিশকেও জানাচ্ছি।' পুলিশের কথা বলে নিজেরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

অনেক কারণে দিল্লি আমার অন্যতম প্রিয় শহর ঠিকই কিন্তু রাজধানীতে যেসব ভয়াবহ অপরাধের খবর পড়ি বা টিভিতে দেখি তাতে কেঁপে ওঠে গোটা দেশ। মেয়েটার সঙ্গে আরও লোকজন ঢুকে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো। আমাকে খুন করে গায়ের কয়েকটি গয়না আর ব্যাগের টাকা নিয়ে চলে যাবে। চার-পাঁচজন মিলে আক্রমণ করলে পুলিশ ডাকবার সময় পাবো না আমি। ভয়ে আমি ঘেমে উঠলাম।

দরজাটা খুলে বেরিয়ে যাবো ঠিক করলাম।

ব্যাগে মোবাইল ফোন। ফোন বের করলেই যদি দু-চারজন মিলে ফোনটা কেড়ে নেয়।

দরজার কাছেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঝট করে খুলে ফেললাম দরজাটা।

পিছিয়ে এসে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। দ্রুত পায়ে জনশূন্য করিডোর ধরে লিফটের সামনে এসে পাগলের মতো লিফটের বোতাম টিপতে লাগলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নেমে এল লিফট। লিফটে ঢুকে লিফটের দরজা বন্ধ হতে আমি ব্যাগ থেকে বের করলাম মোবাইল।

কোথায় ফোন করি! ভাবতে ভাবতে লিফট চলে এল রিসেপশন কাম লবিতে।

রিসেপশনে চার-পাঁচজন ঝকঝকে ছেলেমেয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আমার উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে তারা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করছিল।

আমি তাদের বললাম। আমি জানতে চাই আমার ঘরে কে ঢুকে বসে আছে। দুপুরে একবার এসেছিল একটা মেয়ে তারপর আবার এখন সে ঘরে ঢুকে বসে রয়েছে।

রিসেপশনের একটি মেয়ে আমাকে বলল, ওকে; উই আর চেকিং। প্লিজ বি সিটেড ম্যাম। ডু ইউ নিড সাম ওয়াটার অর সামথিং? ইভন উই ডোন্ট নো হু ইজ ইন ইয়োর রুম। উই হ্যাভ টু চেক।'

এরপর পরের রবিবার

রবিবারের বেঙ্গল
যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

ছো ট গ ল্প

সঙ্গদান

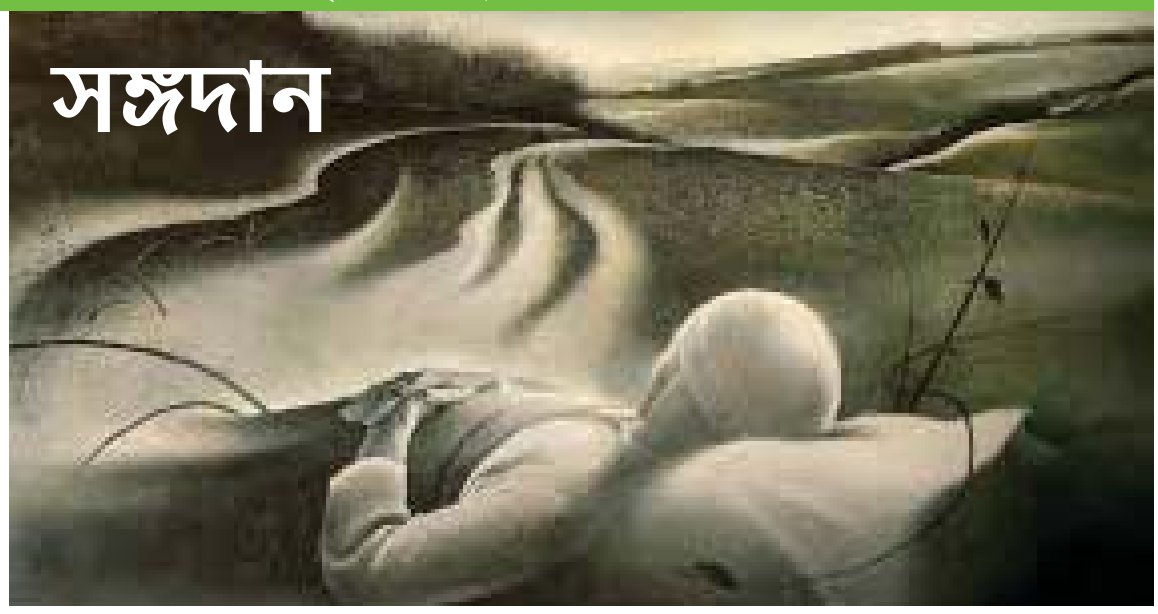

তুষার সরদার

সকাল দশটা। শেষ বর্ষার ঘিনঘিনে আকাশের সর্বত্র খাবলা খাবলা কালো কুৎসিত মেঘ অতিকায় সরীসৃপের মতো সন্তর্পণে ঘুরছে। তাদের মাঝখানে পড়ে গিয়ে সহায়হীন দুর্বল সূর্যের মাঝে মাঝে দম আটকে আসছে। ক্লিষ্ট ধীর পায়ে রাস্তা দিয়ে ঘষটে হেঁটে যাচ্ছিলেন সমিধ। তাঁর মাথাটা বুকের উপর প্রায় ঝুলে পড়েছে। দুপাশ দিয়ে হেঁটে চলা বা দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের কারও দিকেই তাঁর কোনও দৃষ্টি নেই, আগ্রহও নেই। তাঁর সমগ্র ভুবন এখন রক্তাক্ত-বেদনাদিগ্ধ-জীবন্মৃত।

নিজে যথেষ্ট অসুস্থবোধ করা সত্ত্বেও তিনি একরকম বাধ্য হয়েই বেরিয়েছেন। কারণ তাঁর স্ত্রী আরও অসুস্থ অবস্থায়, প্রায় শয্যাশায়ী। অবশ্য গত শনিবার থেকে শয্যা তাঁকেও ক্রমাগত প্রবলভাবে ডাকছে। তবু অসুস্থ স্ত্রীর ওষুধ আনার জন্যই সমিধকে বেরোতে হয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁদের বাড়িতে তাঁরা মাত্র দুজনই ভীষণভাবে একাকীত্বে নিষ্পেষিত।

তাঁর পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে একজন ভদ্রলোক তাঁর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। সমিধ সেসব খেয়াল না করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। খেয়াল করার কথা ওঠেও না। কিন্তু সেই ভদ্রলোক তাঁর পিছু পিছু দ্রুত হেঁটে এসে তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়ে ডাকলেন,'আরে এই যে সমিধবাবু, আপনার কথাই তো কদিন ধরে মনে মনে ভাবছিলাম। কেমন আছেন বলুন? আচ্ছা।' তারপর গলা নামিয়ে চট করে বেশ বিষণ্ণ ভাব নিয়ে সেই ভদ্রলোক সমিধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা কথা শুনলাম, ইয়ে, আপনার ছোট ছেলেটি নাকি, ইয়ে মানে যা শুনলাম আর কী...'

'ঠিকই শুনেছেন। গত শনিবার এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় তাকে হারিয়েছি!'

'ই-স্-স্-স্! কী গভীর দুঃখের কথা! ই-স্-স্। সবই কপালের ফের! কী আর করবেন বলুন? খবরটা শোনার পর আমি তো আপনার বাড়িতে একেবারে সস্ত্রীক চলে যাব বলে ঠিক করেও ফেলেছিলাম। কিন্তু নানারকম জরুরি কাজকর্মের ঝামেলা এসে পড়ায় যেতে পারলাম না। সেজন্য কিছু মনে করবেন না যেন!'

'না না, এতে মনে করার কী-ই-বা আছে। তাছাড়া এখন কোনও ব্যাপারে কিছু মনে করার বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি।'

'মন শক্ত করুন, মন শক্ত করুন, মন শক্ত করতেই হবে। শাস্ত্রে কী বলেছে জানেন? শাস্ত্রে বলেছে, মৃত্যু নিয়ে শোক করা নিতান্তই বৃথা। আপনার এই অবস্থা, এদিকে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আপন পিসতুতো ভাইয়ের বন্ধুর ছেলের কথা শুনবেন? শুনুন তবে। ছেলেটি সেকেন্ড কী থার্ড ইয়ারে পড়ে। ওন্‌লি সান অব দ্য ফ্যামিলি। ভে-এ-এ-রি ব্রিলিয়ান্ট! ওদিকে ব্যবসায়ী বাবার তো বিশাল অবস্থা। কলকাতায় দু-দুখানা সাততলা বিরাট শপিংমলের মালিক। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। সেন্ট্রালি এয়ার-কন্ডিশন্ড বিশাল বাড়ি। গ্যারেজে চার-পাঁচখানা চারচাকা। দু'চাকার গাড়ি যে ক'খানা সে কথা ছেড়েই দিলাম। জানেন তো গাড়িগুলোর প্রায় সবকটাই লেটেস্ট মডেলের ইমপোর্টেড কার! তার ওপর দিল্লি, আমেদাবাদ আর মুম্বইতে একেবারে পশ এরিয়াতে—'

'আমি-আমি এখন ওষুধের দোকানে যাব। আমার স্ত্রী অসুস্থ। ওষুধ নিয়ে গেলে তবে তাঁকে খাওয়ানো হবে।'

'আচ্ছা-আচ্ছা, তাহলে চলুন ওষুধের দোকানের দিকেই না হয় যাওয়া যাক। আপনাকে এই মুহূর্তে খানিকটা সঙ্গ দেওয়া উচিত। তাছাড়া এখন কিন্তু একা একা আপনার বেরুনো একেবারেই ঠিক হয়নি। বিশেষ করে এই সময় একা বেরুনো কক্ষনও উচিত নয়।'

'এই সময় একা বেরুনো উচিত নয়! কেন?'

'দেখুন, এসব আমার নিজের কথা নয়, শাস্ত্রে যেটা বলা আছে সেটাই আপনাকে সেটাই বলছি। একেই তো এটা একটা অপঘাতে মৃত্যু, অর্থাৎ এক অপঘাতী প্রেত, তায় আবার নিজের ছেলের। এসময় একা একা থাকলে কিন্তু আপনার কাছে আসবার এমনকী আপনাকে তার কাছে টেনে নেওয়ার একটা প্রবল চেষ্টা সে করতে পারে! বিশেষ করে তাকে আপনি খুবই ভালোবাসতেন কি না!'

'তাহলে আপনার কথার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যন্ত্রণার অনেক গভীর থেকে উচ্চারণ করতে থাকেন সমিধ— 'আমার ছেলেকে খুব ভালোবাসতাম বলে এখন আমার ছেলের আত্মা আমাকেই মেরে ফেলতে পারে! আপনি এসব কী বলছেন?'

'পারেই তো। তবে এসব আমি তো বলছি না, শাস্ত্র বলছে। অবশ্য এসব অতি অন্তর্গূঢ় প্রেততত্ত্বের জটিল ব্যাপার। এসব ব্যাপার সবসময় সকলের বোধগম্য নয়।'

'যদি তাই হয় তাহলে কিচ্ছু না বুঝে আমি এখন সেটাই চাই! যে কোনও মূল্যে আমার সেই হারানিধি আমি ফিরে পেতে চাই এখনিই!'

'দেখুন, আমি আপনার একজন হিতৈষী এবং সহমর্মী বলেই এসব কথা বললাম। নইলে আমার নিজস্ব কাজ ছেড়ে এখন আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার বা এত কথা বলতে যাওয়ার কোনও দরকার ছিল না। এসব কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। যাক্ গে এখন চলুন। আপনার সঙ্গে ওষুধের দোকানের ওদিকে যেতে যেতেই না হয় ওই আগে যে-ঘটনাটা বলছিলাম সেটাই এখন বলি শুনুন। শুনে তবু ওইদিক থেকে একটু অন্যদিকে মনটা ঘোরাতে পারবেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম — তার ওপর সেই ছেলে বায়না ধরে বসল তার একটা হাজার সি.সি-র বিদেশি বাইক চাই। তো বায়নামতো ফরেন থেকে কেনা হল সেই বাইক। এগারো দিনের মাথায় জোর বাইক অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়ে সোজা হাসপাতাল। বড় খরচের প্রাইভেট হাসপাতাল অবশ্য। সাত সাতটা ফ্র্যাকচার! বাঁচবে কী বাঁচবে না! যমে-মানুষে সে কী টানাটানি! শেষে চোদ্দোদিন পর প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে সোজা একেবারে স্টেটসে। পাক্কা তিনমাস সেখানে চিকিৎসার পর তবে ছাড়া পেল। কিন্তু কত ভোগান্তি হল বলুন দেখি? একইরকম আর একটা ঘটনা বলছি শুনুন। তবে এটা আরও বেশি মর্মান্তিক। শুনলে আপনি একেবারে অবাক হয়ে যাবেন। আমার নিজের অফিস-কোলিগের খুড়তুতো বোনের দেওরপোর ঘটনা। তার হয়েছে কী জানেন—'

'ওষুধ দোকানটা এসে গেছে। এবার আমাকে ওষুধটা কিনে নিতেই হবে। নিয়ে গেলে তবেই—'

'আগে তাহলে ওষুধটা কিনে নেবেন? আচ্ছা, ঠিক আছে আগে ওষুধটা না হয় কিনেই নিন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। ওদিকে আবার আমার অনেকগুলো বিশেষ দরকারি কাজ পড়ে রয়েছে। তবুও আপনার এই মারাত্মক দুঃসময়ে একজন প্রকৃত সহমর্মী হিসাবে না হয় আপনাকে আরও খানিকটা সঙ্গ দিই, যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। ওষুধটা কিনে আনার পরই না হয় ওই ঘটনাটা বলছি। সবটা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনার পর সমিধ পথে নামতেই সেই সহমর্মী ভদ্রলোকটি আবার তাঁর পাশে চলে এসে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন,

'শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় কী বলেছে শুনুন। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে যে —বাসাং অতি জীর্ণং যথাং বিহঙ্গম্, —মানেটা হল গিয়ে, বাসা খুব পুরনো হয়ে গেলে রোদে—জলে পচে গলে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তখন বিহঙ্গ, মানে পাখি যেমন সেই পুরনো বাসাটি ছেড়ে একটি নতুন বাসা তৈরি করে নিয়ে চলে যায়, এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে দেহ অতি পুরনো হয়ে গেলে মানুষও তেমন বৃদ্ধ জরাজীর্ণ দেহটি বাতিল করে দিয়ে অন্য একটি নতুন দেহে ঢুকে পড়ে। সুতরাং সেজন্য আপনি এতটা মনখারাপ করবেন না।'

বিবর্ণ রক্তহীন কর্কশ সকাল বুকে পুরে নিয়ে সমিধ কোনওমতে বললেন, 'আপনি কী বলছেন? অতি পুরনো? জরাজীর্ণ? আমার ছেলের বয়স হয়েছিল মাত্র উনিশ বছর!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অল্পবয়সিদের মৃত্যুর কথাও গীতাতে কোথাও না কোথাও স্পষ্ট লেখা আছে বলে যেন কার কাছে শুনেছি। আমি তো প্রত্যহই গীতাপাঠ করি। আপনিও করবেন। বিশেষ করে এই অবস্থায় শান্তি পেতে হলে প্রত্যহ গীতাপাঠ একান্তই প্রয়োজনীয় জানবেন। এইবার সেই দারুণ প্যাথেটিক ঘটনাটার কথাটা বলি শুনুন। আপনার ছেলের ঘটনার থেকেও এই ঘটনাটা আরও বেশি—'

'আমাকে এবার বাড়ি ফিরতেই হবে।' সান্ত্বনাবিদ্ধ সমিধ কোনওমতে এবার একটু সোজা হওয়ার চেষ্টা করলেন, 'আমি পরে কোনও একসময় আপনার কাছে জমে থাকা সব দুর্ঘটনার কথা শুনে নেবো।'

'ইয়ে, আচ্ছা তাহলে বরং আমি যেভাবেই হোক সময় করে একদিন আপনার বাড়িতে যাবো। সেদিন ধীরে-সুস্থে এসব কথা হবে। গীতা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করব। আমি না হয় একখানা গীতা সঙ্গে করে নিয়েই যাবো। এখন শুধু গীতাপাঠ আর গীতা আলোচনাই একমাত্র কর্তব্য। আর গীতা আলোচনা মানেই পুণ্যার্জন-সহ শান্তিলাভ— আর গীতার সংক্ষিপ্তসারটা হল— একান্তই চললেন তাহলে—'

ক বি তা

ঋতু
কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

আঘাত কী খুঁজেছে তবে ঋতু
লালমাটির রাস্তা পিচ হয়ে এখন কালো
গহ্বর জুড়ে আজও নক্ষত্র জ্বলে
ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে আছে কিছু অঙ্কের চিপ
সব সমস্যা ও সমাধান নতুন ইক্যুয়েশন
ফর্মুলার শরীর দিয়ে ঈশ্বর গড়িয়ে পড়ছেন
প্রকৃতিতে ঋতু জুড়ে সম্পর্কেরা অবিনশ্বর
সীমাহীন পথ হেঁটে যাচ্ছে...
প্রতিটি বাঁক গহ্বর বিগব্যাং-এ
একজন করে প্রেমিকা দাঁড়িয়ে থাকে
পাতা ঝরে পড়ে অরণ্য হলুদ হয়
রঙিন বসন্ত আসে বিশ্বে

ইতিহাস
সৌরভ চন্দ

শরীরের তাস ফেলে দিলাম
এবার শুরু হবে ভালোবাসার উৎসব
ঢাক বাজবে, হালুইকর আসবে
আমাদের প্রাচীন বাড়ি থেকে
সাপের মতো বেরিয়ে আসবে ইতিহাস।

বর্ণসাজ
রবীন বসু

পোড়া দাগ মুছে দিতে দিতে যে-হাতখানা
গভীর দুঃখ ছুঁয়ে দিল
তার হাতেও কান্নার ফোঁটা
জলের অতল থেকে যাবতীয় শ্যাওলারা
যে প্রাচীন উল্লাস নিয়ে সবুজকে বন্দনা করে
হে নব্য কবি, তুমিও তার থেকে ধার নাও উৎসাহ...
শিখে নাও কী করে ঘ্রাণ নিতে হয় শব্দের
কী করে যাপন করবে সমূহ উৎসব?
দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে যে আলো জ্বলে
যে বিভা ছড়িয়ে পড়ে জীবনের অন্ধতম কোণে
যাবতীয় অন্বেষণ প্রার্থিত প্রত্যাশার হাত ধরে
তাকে ছুঁয়ে দেখো, তাকে জড়িয়ে নাও দেহে
আদাড়-বাদাড় ঘুরে বেহদিশ হাওয়া
যদি ঘরমুখো হয়,
সঠিক যত্ন নিয়ে পিঁড়ি পেতে উঠোনে বসাও—
তারপর গল্প শুনো, ছেড়ে আসা মাঠ-ঘাট
পরিত্যক্ত প্রান্তরের গল্প, সে-গল্পে জীবন পাবে
পাবে এক অন্যতর গন্ধবহ সুবাতাস।
দূষণের শিকড় যত দূর বর্ষিত হোক
তুমি নব্য কবি, দু'হাতে মুঠো ভরে তুলে নাও
সুবিমল অক্ষরের মায়াময় বর্ণসাজ।

চ্যাপলিনের মা ছিলেন আকর্ষণীয় গায়িকা ও অভিনেত্রী। শুধু মা নন, চ্যাপলিনের বাবা চার্লস চ্যাপলিন সিনিয়র ছিলেন একজন প্রতিভাবান বেহালাবাদক ও অভিনেতা। চ্যাপলিন সিনিয়র মঞ্চ অভিনয়ে সুনাম অর্জন করলেও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। চার্লি চ্যাপলিনের বাবার উদাসীনতায় চরম অভাবের মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু হয় তাঁর।

বিশেষ নিবন্ধ

চার্লি থেকে চ্যাপলিন হয়ে ওঠা

অসিতকুমার চক্রবর্তী

সিনেমার ইতিহাসে নজর রাখলে কয়েকজন কিংবদন্তির মুখ প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর হাস্য-কৌতুকের কথা মনে পড়লে সবার আগে রোগা ছিপছিপে চেহারার যে মানুষটার মুখ মনে পরে আগামিকাল তাঁর জন্মদিন। এই কিংবদন্তি আর কেউ নন ‘গোল্ড রাশ’, ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ খ্যাত চার্লি চ্যাপলিন। আলোর পিছনে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি মানুষটা কৌতুক অভিনেতা হিসাবে পরিচিত হলেও তাঁর জীবনটা কিন্তু এত সহজ ছিল না। নিদারুণ দারিদ্র্যতা, পারিবারিক অশান্তি, মানসিক টানাপোড়েন, এসব সঙ্গে নিয়েই তাঁর সফল হয়ে ওঠা। তাঁর অভিনয় জগতে প্রবেশের পথটাও খুব একটা মসৃণ ছিল না। কিন্তু তার মধ্যেই অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে জীবনযুদ্ধে জয়ী কিংবদন্তি অভিনেতা চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন ওরফে চার্লি চ্যাপলিন।

তাঁর অভিনীত সিনেমাগুলি দর্শকদের কাছে আজও সমান জনপ্রিয়। কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয়েছিল বলেই হয়তো সেই কষ্টগুলোকে অবলীলায় নিজের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের একটি উক্তির কথা বলতেই হয়, ‘আমার কষ্ট কারও হাসির কারণ হতে পারে। কিন্তু, আমার হাসি যেন কারও কষ্টের কারণ না হয়।’

১৮৮৯ সালের ১৬ এপ্রিল এই মহান অভিনেতা লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনে নানারকম টানাপোড়েন শুরু হয়। আর্থিক অনটনের কারণে মাত্র তেরো বছর বয়সে চ্যাপলিনকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। এই সময় তিনি নানান ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তবে অভিনয়ের লক্ষ্য থেকে কখনই সরে আসেননি।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে প্রথম মঞ্চে ওঠা চ্যাপলিনের। সেদিন থিয়েটারে বহু মানুষের সামনে গান গাইতে গিয়ে তাঁর মা হান্না চ্যাপলিনের সুর কেটে গিয়েছিল। তখন লোকজনকে খুশি করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ছোট্ট চ্যাপলিনকে মঞ্চে ডেকে নিয়ে আসেন। চ্যাপলিনের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ছোট্ট চ্যাপলিন সেদিন অভিনয়গুণে সবার মন জয় করেছিলেন। সেই সঙ্গে দুষ্টুমি মাখা মুখভঙ্গি করতেও ভোলেননি। সেই রাতে চ্যাপলিন প্রথম সবার সামনে গেয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর মা আর কখনও গলায় সুর ফিরে পাননি। সেই রাতেই চ্যাপলিনের মা হান্না চ্যাপলিন জীবনে শেষবার মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। চ্যাপলিন নিজের আত্মজীবনীতে তাঁর অভিনয়দক্ষতার পিছনে মায়ের অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন।

চ্যাপলিনের মা ছিলেন আকর্ষণীয় গায়িকা ও অভিনেত্রী। শুধু মা নন, চ্যাপলিনের বাবা চার্লস চ্যাপলিন সিনিয়র ছিলেন একজন প্রতিভাবান বেহালাবাদক ও অভিনেতা। চ্যাপলিন সিনিয়র মঞ্চ অভিনয়ে সুনাম অর্জন করলেও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। চার্লি চ্যাপলিনের বাবার উদাসীনতায় চরম অভাবের মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু হয় তাঁর। তবুও তাঁর মা ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে তখনও তীব্র লড়াই চালাচ্ছেন। তাই বলা যায়, আর পাঁচটি অভিজাত শিশুর মতো চ্যাপলিনের জীবন সুখের সাম্রাজ্যে গা ভাসিয়ে শুরু হয়নি। প্রতি মুহূর্তে লড়াই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। খাওয়ার সংস্থান নেই, পরিবারে আর্থিক কষ্ট তাই লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে- এই চরম সত্যটা ওই ছোট বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন চ্যাপলিন।

জীবনের শুরুতে তাঁর মা ও ভাই একসঙ্গে লন্ডনে থাকতেন। দারিদ্রতা মোকাবিলা করার জন্য গানের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে নার্সিং করে ও জামাকাপড় বানিয়ে হান্না চ্যাপলিন জীবিকা নির্বাহ করতেন। চ্যাপলিন সিনিয়র তাঁর ছেলেদের কোনও খরচ দিতেন না। চ্যাপলিনের যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁকে পাবলিক বোর্ডিংয়ে পাঠানো হয়। সেখানে কাজের বিনিময়ে দুঃস্থ শিশুদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। একটা সময় অপুষ্টি ও সিফিলিসের সংক্রমণের কারণে মানসিক ব্যাধির শিকার হন হান্না চ্যাপলিন। সেই সময় তাঁকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন চ্যাপলিন আর তাঁর ভাইকে চ্যাপলিন সিনিয়রের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে দুই সন্তানকে মারধর করতেন চার্লি চ্যাপলিনের বাবা। ৩৭ বছর বয়সে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় চ্যাপলিন সিনিয়রের। মানসিক হাসতাপালে চিকিৎসারত অবস্থায় ১৯২৮ সালে মারা যান হান্না চ্যাপলিন।

চ্যাপলিন তাঁর বাবার সূত্র ধরে দ্য এইটথ ল্যাঙ্কাশায়ার ল্যাডস নামের একটি নাচের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে নাচের দলটি ইংল্যান্ডের সমস্ত মিউজিক্যাল হল পরিভ্রমণ করে। আর এভাবেই মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে লন্ডনের ওয়েস্টএন্ডে একটি নাট্য সংস্থার সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের পেশাদার কেরিয়ার শুরু। সংস্থাটির ম্যানেজার চ্যাপলিনের মধ্যে প্রতিভা দেখে তাঁকে মঞ্চে অভিনয় করার সুযোগ করে দেন। ১৯০৩ সালে কিংস্টন আপন টেমসে নাটকটির প্রদর্শনী শুরু হয়, কিন্তু দর্শক সেইভাবে না আসায় মাত্র দুই সপ্তাহ পর প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য চ্যাপলিনের কৌতুকপ্রদ অভিনয় সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি পরপর দুটি ভ্রমণে ‘বিলি দ্য পেইজ বয়’ চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। তিনি এতটাই সফল হয়েছিলেন যে বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার ও অভিনেতা উইলিয়াম জিলেটের সঙ্গে লন্ডনের মঞ্চে অভিনয় করার ডাক পেয়েছিলেন। চ্যাপলিন মাত্র আঠারো বছরেই একজন গুণী কমেডিয়ান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

১৯০৮ সালে ফ্রেড কার্নোর সুবিখ্যাত কমেডি কোম্পানিতে চ্যাপলিন একজন তারকা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর ভাইয়ের জন্য দুই সপ্তাহের ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেছিলেন। কার্নো প্রথমে শীর্ণকায়, লাজুক তরুণ চ্যাপলিনকে দেখে ভরসা করতে পারছিলেন না। ওরকম একটা চেহারা দেখে ভরসা করবেনই-বা কী করে। এর যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন চ্যাপলিন। লন্ডন কলিসিয়ামের প্রথম রাতের পারফরমেন্সেই নিজের জাত চিনিয়েছিলেন। নাটকের প্রধান অভিনেতার চেয়ে তাঁর স্বল্প সময়ের অভিনয়ে হাততালি পড়েছিল বেশি। এরপরই নাট্যদলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে। কার্নো কোম্পানির সঙ্গে চ্যাপলিনের দ্বিতীয় আমেরিকান ট্যুর অবশ্য সাফল্য লাভ করতে পারেনি। নাট্যদলের অভিনয়শিল্পীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি দর্শকরাও তাঁদের ব্যঙ্গাত্মক হিউমার উপলব্ধি করতে পারেনি। ছয়মাসব্যাপী ট্যুরের মাঝখানে চ্যাপলিনের ম্যানেজারের কাছে একটি টেলিগ্রাম আসে। নিউ ইয়র্ক মোশন পিকচার্স কোম্পানির এক সদস্য চ্যাপলিনের অভিনয় দেখে তাদের কিস্টোন স্টুডিওজ-এর বিদায়ী তারকা ফ্রেড মেসের জায়গায় তাঁকে নেওয়ার কথা চিন্তা করেই এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

চ্যাপলিন যেসব ফিল্মে অভিনয় করতেন সেগুলোতে নিজে পরামর্শ দেওয়ারও চেষ্টা করতেন। তাঁর আইডিয়াগুলো নিয়ে পরিচালকদের সঙ্গে প্রায় বাক্‌বিতণ্ডা লেগেই থাকত। দশম ফিল্মে কাজ করার সময় পরিচালক ম্যাবেল নরম্যান্ডের সঙ্গে চ্যাপলিনের ঝগড়াও হয়। এর ফলে চ্যাপলিনের চুক্তি প্রায় ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেই সময় চ্যাপলিনকে নিয়ে ফিল্ম বানানোর অনুরোধ আসতে থাকায় পরিচালক ম্যাক সেনেট তাঁকে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি চ্যাপলিনকে চলচ্চিত্র পরিচালনা করার সুযোগও করে দেন। শুধু তাই নয়, ফিল্মটি সফল না হলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সেই সময়ের দেড় হাজার মার্কিন ডলারের একটি ইনসিওরেন্সের শর্তও দিয়েছিলেন।

চ্যাপলিনের প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘কট ইন দ্য রেইন’ এখনও পর্যন্ত কিস্টোনের সবচেয়ে সফল চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। ‘হিজ নিউ জব’ (১৯১৫)-এ অভিনয়ের জন্য তিনি প্রথম স্ক্রিন ক্রেডিট পান। তারপর চ্যাপলিনকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

চ্যাপলিনের এরপরের জীবন অবশ্য একটু অন্যরকম। ১৯১৮ সালে তিনি বিয়ে করেন মিলড্রেড হ্যারিস নামে এক অভিনেত্রীকে। তবে সে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই সময়টা ছিল তাঁর চরম মানসিক অস্থিরতার একটা সময়। মিলড্রেডের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আরও দু-দুবার বিয়ে করলেও কোনও সংসারই টেকেনি। ৫৩ বছর বয়সে চার্লি ফের বিয়ে করেন ওনা ও’নেল-কে। ওনা’র তখন বয়স ছিল ১৮ বছর। সম্ভবত ওঁর সঙ্গেই তাঁকে সুখী করেছিল।

কষ্টের মধ্যে থেকেও মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিংবা ক্যামেরার সামনেও যে হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শককে আনন্দ দেওয়া যায়, তাঁর একটা বড় উদাহরণ এই কিংবদন্তি। জীবনে কম প্রতিবন্ধকতার মুখে তো তাঁকে পড়তে হয়নি। তবুও নিজের প্রচেষ্টা এবং ইচ্ছেশক্তির বলে হয়ে উঠেছেন একজন কিংবদন্তি অভিনেতা। যা সকলের কাছেই অনুপ্রেরণা।

রবিবারের বৈঠক
যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

আট বছর বয়সে প্রথম গ্রামে এলাম

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আজকের দিনে বিজ্ঞানসচেতন মানুষ ঝাড়ফুঁক, তুক-তাক, ওঝা-বৈদ্য— এসবে বিশ্বাস করে না। না করার কারণও আছে। এইসব যাঁরা করে বেড়ান তাঁদের অধিকাংশই প্রতারকের দল। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় আমি এমনই একজন দেখেছিলাম যাকে কখনও ভুলব না। সে হল পুণ্যয়োজা (ওঝা)। আমি সব সময় যেখানে-সেখানে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতাম, তাই যখন-তখনই আমার হাওয়া-বাতাস ইত্যাদি লাগত। আমি তখন কেমন যেন করতাম। বাবা গিয়ে পুণ্যয়োজাকে খবর দিলেই সে এসে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র বলে গা ঝেড়ে দিত আমায়। সত্যি বলতে কী ঝাড়ফুঁকের পর ভালো হয়ে যেতাম আমি।

পুণ্যদা থাকত দাঁয়েদের বাজারের কাছে। কাজ করত বেঙ্গল জুটমিলে। জুটমিল থেকে সে অনেক তেলপাট নিয়ে আসত। আমাদের ঘুঁটে-কয়লার উনুন ধরানোর জন্য ঘরে গিয়ে একপয়সা দাম দিয়ে তেলাপাট কিনে আনতাম।

কিছুদিন পরে সে হাওড়া রাজবল্লভ সাহা লেনের নিষিদ্ধপল্লির এক মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করতে লাগল। ওর বউটি ছিল বড় ভালো। আমি যখন তখনই ওদের পুণ্য য়োজার খোঁজে গেলে ওর বউ আমাকে কত আদর করত। কাজল পরিয়ে পাউডার মাখিয়ে দিত। কত কী রান্না করে খাওয়াত। অন্য মেয়েরাও কত আদর করত আমাকে। তা এই পুণ্যয়োজা একবার এক অসাধ্য সাধন করেছিল। সে কথাই বলব এবার।

আমরা যে-বাড়িতে থাকতাম সেই বাড়িরই অন্য প্রান্তে পাশাপাশি ঘরে শান্ত পিসিমা, পদ্মাদি ওরাও সব ভাড়া থাকতেন। পদ্মাদি একবার গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি পঞ্চপাণ্ডবের মা হতে চলেছেন। সে কথা আমার বাবাকে বলতেই বাবা বলবেন, 'এ তো দারুণ আনন্দের কথা, তাই বলি, প্রথমেই যদি ছেলে হয় তার নাম রেখো যুধিষ্ঠির।'

তখনকার দিনে জননীরা সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে যেতেন না। নার্সিংহোম হয়তো ছিলই না তখন। বাড়িতে সন্তানের জন্ম দিতেন। তা পদ্মাদির খুব শরীর খারাপ অর্থাৎ সন্তান হওয়ার বেদনা শুরু হলে মা আমাকে বললেন ভব দাইকে ডেকে আনতে। ভবর হাতযশ ছিল খুব। সে কথা যাক, পদ্মাদির একটি ছেলে হল। তার নাম যুধিষ্ঠির। এরপর প্রতি এক-দেড় বছর অন্তর একটি করে ছেলে হতে লাগল পদ্মাদির। পরেরটি হল দারুণ মোটাসোটা, তাই তার নাম রাখা হল ভীম। তারপর ছিপছিপে সুদর্শন একটি ছেলে হলে তার নাম হল অর্জুন। তারও পরে নকুল, সহদেব। সহদেবের পরে হল একটি মেয়ে। সবাই বলল, 'ওর নাম রাখো দ্রৌপদী।' বাবা আপত্তি করলেন। বললেন, 'এ নাম রেখো না। দ্রৌপদী।' দ্রৌপদী তো পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। এ হল বোন। এর অন্য নাম রেখো। অতএব ওর নাম রাখা হল শিখা। তারপরে আরও দুটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে হল।

যাই হোক, এই বলবান শিশু ভীমের একবার কঠিন অসুখ হল। হাওড়া শহরের বড় বড় ডাক্তাররা ভীমকে দেখে বললেন, 'এর রোগ আমরা সারাতে পারব না, একে হাসপাতালে দিন।' রোগটা হল প্রতিদিন দুপুরের দিকে প্রবল জ্বর, সারা দুপুর-বিকেল-রাত্রি জ্বর। সকালে জ্বর ছেড়ে যাওয়া। এর ওপর পেটের গোলমাল। ভীমকে তখন রিকেটগ্রস্ত শিশুর মতো দেখতে লাগত।

তা সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, ভীমেরও তখন শেষ অবস্থা। আমার মায়ের পরামর্শে ওদের ও পরিবারের মত নিয়ে আমিই গিয়ে খবর দিলাম পুণ্যয়োজাকে। পুণ্যদা ভীমকে দেখেই বলল, 'একে খুব খারাপ রকমের ভূতে ধরেছে। তাড়ানো মুশকিল। তবু চেষ্টা করে দেখব।' বলে কতকগুলো বিধান দিল। পরে ঠিক ভর সন্ধেবেলা এসে অনেক রকম মন্ত্র বলে গায়ে সরষেধোঁয়া দিয়ে প্যাঁকাটির আগুন করে মুখে ধোঁয়া দিয়ে সে কী ভয়ানক কাণ্ড একটা করতে লাগল। সেই ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ধোঁয়ার দাপটে কেঁদে-কঁকিয়ে প্রাণান্তকর চিৎকার করতে লাগল ভীম। কাজ শেষ হলে পুণ্যদা চলে গেল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার জ্বরও ছেড়ে গেল একেবারে।

এরপর আর কোনও ডাক্তারি ওষুধ নয়, পুণ্যদার দেওয়া একরকমের ওষুধ ছাগলের দুধের সঙ্গে খেতে খেতে ভীম সুস্থ হয়ে আবার আগের চেহারায় ফিরে এল। এখনকার দিনে এই সমস্ত গল্প কারও কাছে করলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। বলবে এসব হল অন্যের মহিমা বাড়ানোর জন্য বানানো এবং গাঁজাখুরি গল্প।

এবার আমাদের পৈত্রিক নিবাস অর্থাৎ দেশের কথা বলি। আমাদের দেশ হল বর্ধমান জেলায় রায়নার কাছে নাড়ুগ্রাম। চলতি কথা নাড়গাঁ। আগে এটি রায়না থানার অন্তর্গত ছিল। এখন নাড়ুগ্রামেই থানা হয়েছে, তা সে যাই হোক, এই রায়না থানার অন্তর্গত গ্রামগুলোতে বহু খ্যাতনামা কবি জন্ম নিয়েছেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, শশীরাম দাস, শ্রীধর্মমঙ্গলের রচয়িতা কবি ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ। আমার আট বছর বয়সে প্রথম আমি গ্রামে এলাম। আমার দিদি-জামাইবাবু এবং দূর সম্পর্কের এক পিসিমা ও পিসেমশাইয়ের সঙ্গে। অবশ্য আমার মা-ও ছিলেন সঙ্গে। বাবা অফিসের ছুটি পাননি বলে যেতে পারেননি। উপলক্ষ ছিল গাজন।

বর্ধমান সদর ঘাটে বাস থেকে নেমে অনেকখানি চরা হেঁটে নৌকোয় দামোদর নদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে আবার বাস। সেই বাসে সগরাইয়ের মোড় পর্যন্ত গিয়ে তিন-চার মাইল হেঁটে তবেই আমাদের গ্রাম। আমাদের গ্রামে আছেন ধর্মরাজ শিব। লাউসেন কর্পূরসেনের আমলে রঞ্জাবতীর প্রতিষ্ঠা করা। বৈশাখ-সংক্রান্তিতে গাজন হয়। ঊর্ধ্বসেবা, শালে ভর, কাঁটা পোড়ানো, বাণ ফোড়া, ময়ূরপঙ্খীর গান— কত কী হয় সেই গাজনকে কেন্দ্র করে। আমাদের দেশে এই গাজনকে বলা হয় 'আবাড় গাজন'।

গ্রামে আমাদের দেড় কাঠার মতো ভিটে। মজুমদারা নামে একটি পুকুরের ছ'পয়সার অংশ এবং দুই বিঘা লাখেরাজ ধানজমি ছাড়া কিছুই ছিল না। না-থাকার কারণও আছে। আমার বাবা মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহারা হন। ঠাকুরদা তখন আবার বিবাহ করেন। বিমাতার কাছে বাবার আদর না থাকায় বাবা ঠাকুরদার অন্য ভাইদের কাছে মানুষ হতে থাকেন। পরে বড় হয়ে বাবা কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে চাকরি পাওয়ায় ঠাকুরদা তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে যান। সেটা অবশ্য বাবার অনুমতি নিয়েই এবং বাবার তাতে কোনও আপত্তি ছিল না।

আমার বাবা পৈত্রিক বাসভূমি দেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেননি। ভিটে পুকুর ধানজমি সবই বেচে দেন। আত্মীয়-স্বজনরাও গ্রামের পাট চুকিয়ে যে যার মনমতো স্থানে চলে যান। পরবর্তীকালে আমার আবদারে দেশে গেলে বাবা অন্যত্র উঠতেন। দু-তিনদিন থেকে গাজন দেখে ফিরে আসতেন। সঙ্গে অবশ্য মা, আমিও যেতাম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমার বাবার নাম জিতেন্দ্রনাথ ও মা নন্দরানি। সে জন্য অনেকেই আদর করে আমাকে নন্দদুলাল বলত। যাই হোক, আমার বাবার সারা জীবনের আক্ষেপ ছিল শৈশবকালে মা হারানোর কারণে। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাই যখন-তখন কাঁদতেন। বলতেন, 'মাতৃগর্ভে জন্ম নিলাম কিন্তু মা কী জিনিস তা জানতেও পারলাম না।' আবছাভাবেও মায়ের মুখ তাঁর মনে পড়ত না। শুধু এটুকু মনে পড়ত একবার ঘ্যান ঘ্যান করে মাকে খুব বিরক্ত করেছিলেন বলে মা ওঁকে রাগের মাথায় নড়া ধরে দাওয়া থেকে উঠোনে ফেলে দিয়েছিলেন।

আমার বাবা শৈশবে তাঁর মাকে হারালেও মায়ের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন। তার কারণ আমার ঠাকুরমা সিন্ধুবালা দেবী ছিলেন বর্ধমান জেলার মোহরাবাজারের কাছে কৈয়ড় গ্রামের গোঁসাই বাড়ির মেয়ে। কৈয়ড়ে ঠাকুর অভিরাম গোপালের শিষ্য বেদগর্ভ গোস্বামীর শ্রীপাট। বেদগর্ভের দুই পুত্র। নিত্যানন্দ ও চৈতন্য। বেদগর্ভ গোস্বামী বৃন্দাবনে যমুনার জলে মদনগোপাল মূর্তি আবিষ্কার করেন। সেই মূর্তি আজও কৈয়ড় গ্রামে মদনগোপাল মন্দিরে নিত্যসেবায় আরাধিত। প্রবাদ, বেদগর্ভ গোস্বামী মদনগোপালে লীন হন। কৈয়ড় বর্ধমান জেলার এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। আমার ঠাকুরমা নিত্যানন্দ ও চৈতন্য কোনও এক শাখার মেয়ে। সেহেতু বাবা ওই গ্রামে যাবো যাবো করেও কখনও যাননি, তাই পরিচয়সূত্র হারিয়েই গিয়েছে। পরিণত বয়সে আমি দুবার মদনগোপাল দর্শনে কৈয়ড়ে গেলেও বাবার মাতুলালয়ের সন্ধান পাইনি। সিন্ধুবালার পিতৃপরিচয় জানা থাকলে অবশ্য অসুবিধা হতো না। তবে গ্রামবাসীদের কাছে আমি দারুণ সমাদর পেয়েছি।

যাইহোক, প্রথম গ্রামে যাওয়ার স্মৃতি আমার অল্প অল্প মনে আছে। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের খনি ছিল আমাদের গ্রাম। ঠাকুরপুকুরের ওপারে অনেকটা জায়গা জুড়ে আমবাগান, মজুমদারের পুকুর, হালদার পুকুরের পাড়ে তাল-খেজুরের বন— কত সৌন্দর্য। মাটির ঘর, খড়ের চালা আর ঘন সবুজের সমারোহে চারদিকে ভরা ছিল অপূর্ব এক শান্তশ্রী। গাজনের আগের দিন সন্ধের সময় সন্ন্যাসীরা নাড়েশ্বরতলায় বাঁশের তৈরি উচ্চস্থান থেকে জ্বলন্ত কাঁটার আগুনে ঝাঁপ দিত। সেই প্রথা এখনও আছে। একে বলা হয় কাঁটা পোড়ানো ঝাপান। বোরে এবং বিকেলে গরুর গাড়িকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে গাজনের গান গাইত কিছু মানুষ। সঙ সাজত। দুপুরে ফুলপুকুরে স্নান করে ঊর্ধ্বসেবায় আসতেন সন্ন্যাসীরা। ঊর্ধ্বসেবা হল বাঁশের চতুর্দোলা। তার এক-একটিতে দুজন সন্ন্যাসীকে পা বেঁধে হেঁটমুণ্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। মাথার নীচে থাকত মালসাভর্তি ধুনোর ধোঁয়া। আর হতো শালে ভর। লোহার কাঁটায় শুয়ে কিছু সন্ন্যাসী আসতেন নাড়েশ্বরতলায়। এরপর ফুল বাড়ানো হলে নিয়মভঙ্গ হতো। এই গাজন উপলক্ষে মেলাও বসত। বসত বললে ভুল হবে, নিয়মানুযায়ী এখনও সব কিছুই হয়। তবে আগে সেখানে দশ-বারোটি ময়ূরপঙ্খী হতো, এখন হয় দু-তিনটি। আবার অর্থাভাবে কোনও বছর নাকি হয় না।

প্রথমবারে গিয়ে সকালে ময়ূরপঙ্খী শোভাযাত্রা বেরলে মা আমাকে গ্রামেরই একটি ছেলের সঙ্গে দেখতে পাঠাতেন। ছেলেটি আমারই বয়সি। খুব দুরন্ত। খানিক থাকার পর সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল আর তাকে খুঁজেই পেলাম না। এদিকে আমি তো দিশেহারা। গ্রামের পথঘাট কিছুই চিনি না। তাই এদিক-সেদিক করে একটি ধানখেতের ধারে দাঁড়িয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগলাম। গ্রামেরই কিছু লোক তখন আমাকে কোলে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে লাগলেন। আমি তো নিজের নাম ছাড়া আর কিছুই তখন বলতে পারি না। বাবার নাম বলতে গেলেও কান্নায় গলা জড়িয়ে যায়। যাই হোক, একসময় তারা আমাকে খুঁজে পেতে আমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর একটু বড় হয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে বা কখনও একা অনেকবার গিয়েছি আমাদের গ্রামে। কখনও গাজন দেখতে। কখনও ১৮ ফাল্গুন বারোয়ারি পুজোয়। আমার সৎ ঠাকুরমা অনেকদিন বেঁচেছিলেন। তবুও আমরা আমার ছোড়দাদু ভদু ঠাকুরের বাড়িতে উঠতাম। ভদুঠাকুর মারা গেলেও তাঁর ছেলে অর্থাৎ গুইরাম কাকা ও কাকিমা খুব ভালোবাসতেন আমাকে। আমি তাঁর ছেলেদের সঙ্গে গ্রাম চষে ফেলতাম। এই সময় আমাদের সঙ্গী ছিল একটি কালো কুকুর। আমি গ্রামে গেলে সে যে আনন্দে কী করবে তা যেন ভেবে পেত না। এর কথা পরে বলব। যাইহোক শৈশব স্মৃতির সেই হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো আজও ভুলিনি আমি।

(চলবে)

রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

গ্র ন্থ স মা লো চ না

কবিজীবনের চূড়ান্ত আবেগ

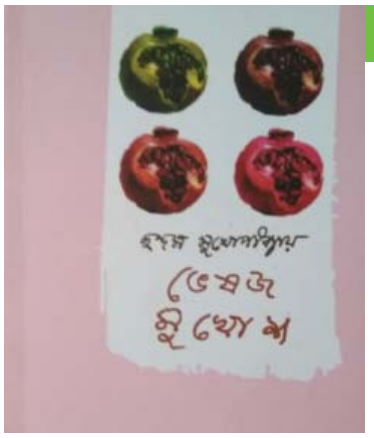

সোমনাথ আদক

কবিতা হল মস্তিষ্কের অন্তরপ্রদেশ থেকে উৎসারিত আলো। কবির কাছে কবিতা খানিকটা জীবনের অগ্নিকুণ্ডে জল-যাপনের আয়না। আর প্রথম বই মানে সেখানে ধরে রাখা শব্দগুচ্ছ কবির বহুদিনের আত্মনিমগ্নতার ফসল হওয়াই উচিত। ছন্দম মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ভেষজ মুখোশ’ তরুণ কবির দিব্যচক্ষুর ডায়েরি বলা যেতে পারে। চৌষট্টি পাতার পেপারব্যাক বইটি হাতে পড়লে নাম অচেনা বলে বা তরুণ কবির বই বলে যাঁরা সোফায় বা খাটের একপাশে ফেলে রাখবেন, এক সম্ভাবনাময় ‘ম্যাজিক-আঙুল’ থেকে বঞ্চিত হবেন তাঁরাই। বইয়ের কবিতাগুলোর বেশিরভাগ কবিতাই মনে দাগ কাটার মতোই। কবি সময়সচেতন। রাজনীতিসচেতন। আবার তিনি অস্বীকার করতে পারেন না প্রবাহমান অতীতকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থে ছন্দমের সময়ের প্রতি, অতীত স্রোতের প্রতি দায়বদ্ধতা ফুটে উঠেছে অনেক কবিতাতেই। বিশেষণ প্রয়োগের অভিনবত্ব পাঠে রসাস্বাদনের সুযোগ করে দেয় প্রতি মুহূর্তে। এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার শেষ লাইনেই লেখা হয়েছে ‘শরীর বেয়ে নেমে আসছে/কোনও ভরদ্বাজ জ্যোৎস্নার যুবক।’ কবির তো স্পর্শকাতর হওয়ারই কথা। ভেষজ মুখোশ কবিতায় ছন্দম লেখেন— ‘এসব ব্যথাতেও ভালো ঘুম হয়, আর এভাবেই অনেক ফুলে ওঠা ঠোঁট মিশে যায়...।’ বেশ কিছু কবিতার শব্দপ্রয়োগের অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো— ‘বেহেড আলোয় ফুটল/মাদি-কামিনীর চোখ/খাবারের তদন্তের চোখ।’ সাধারণ কথা সাধারণ জীবন কত সহজ, অথচ অনন্য অভিঘাত নিয়ে ধরা দেয়— ‘তুমিই তো পূরবতন মালিক/শুরুতে রেখেছিলে/ গরম তরকা মাখানো রুটি, কাঁচা পেঁয়াজ, প্লাস্টিক লংকায়।’ কবিতাগুলোতে স্পেসের খেলাও চমৎকার। তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থেই হয়তো লেখা হয়ে যায় কোনও শাশ্বত পংক্তি, শাশ্বত লাইন— ‘তোমার হত্যাকারীর নাম ভয়।’ আবার কোনও কবিতায় ফুটে উঠেছে কবিজীবনের চূড়ান্ত আবেগ— ‘বেঁচে আছি শব্দের কোটরে।’ কবি মানেই কোথাও না কোথাও থাকবেই ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত, আর সেই ডিপ্রেসিভ অ্যাম্বিয়েন্স জন্ম দেয় কবিতার আবহ— ‘তেইশ বছর ধরে এই ঘর আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছে।’ এই লাইন কবির আত্মকথনও বটে। এত ভালোলাগার বিষয় থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু কবিতায় বেশ কিছু জায়গা আরোপিত মনে হয়েছে। বইটির প্রোডাকশনে প্রকাশক আরও যত্ন নিতে পারতেন।

● ভেষজ মুখোশ | ছন্দম মুখোপাধ্যায় | হাওয়াকল | দাম: ১২৫ টাকা

গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আপনার প্রকাশিত ২ কপি বই পাঠান এই ঠিকানায়:
যুগশঙ্খ সাপ্লি, ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

রবিবারের বৈঠক-এ সকলেই লেখা পাঠাতে পারেন। লেখা পাঠানোর পর অনুগ্রহ করে কেউ ফোন বা মেইল মারফৎ লেখা ছাপানোর জন্য অনুরোধ জানাবেন না। আপনার পাঠানো অপ্রকাশিত লেখাটি মনোনীত হলে অবশ্যই তা ছেপে বের হবে রবিবারের বৈঠক-এর পাতায়। সেক্ষেত্রে কিছু বেশি সময় অপেক্ষা করতেও হতে পারে। মেইল-এ লেখা পাঠালে ইউনিকোড হরফে টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল পাঠাবেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

এই সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

১৫-২১ এপ্রিল

মেষ: মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহের সূচনাটা শুভ বলা যাচ্ছে না। ১৫ তারিখে চন্দ্র দ্বাদশ স্থানে এসে সমস্যার সৃষ্টি করবে। নানা রকমের মানসিক চাপের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হবে। সব কাজেই অপ্রত্যাশিত বাধা আসবে। ১৬-১৭ তারিখে পরিস্থিতি অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। আর্থিক প্রতিকূলতা কেটে যাবে। ১৮-১৯ তারিখের মধ্যে ভাগ্য আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হবে। অন্তভাগের সময়টা রিল্যাক্সড ম্যুডে কাটাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরে তার সুফল পাবেন।

বৃষ: ১৫ এপ্রিল দিনটি আপনার জন্য অশুভ। আর্থিক মন্দার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬-১৮ তারিখের মধ্যেও নানারকম সংকট আপনাকে ঘিরে থাকবে। শারীরিক দিক থেকেও আদ্যভাগের সময়টা ভালো বলা যাচ্ছে না। ১৯-২০ তারিখের সময়টা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভালো। এখন কঠোর পরিশ্রম করলে পরে অবধারিতভাবে তার ফল মিলবে।

মিথুন: ১৫ এপ্রিল বাড়ির জন্য কোনও নতুন জিনিস ক্রয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। সপ্তাহটিতে জাতক-জাতিকাদের লাভবান হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা সমস্ত সরকারি কাজ আদ্যভাগ থেকেই শেষ করার জন্য আপনি কঠোর পরিশ্রম করবেন। সপ্তাহের মধ্যভাগে মূলত ১৭-১৮ তারিখের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-র ভেতর যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। তবে ১৮ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ২০ তারিখ একটু সাবধানে চলবেন। অযথা বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ভালো করে না পড়ে কোনও কাগজে সই করলে পরে পস্তাতে হবে। ২১ তারিখ ধনলাভের যোগ স্পষ্ট।

কর্কট: সপ্তাহের প্রথম দিনই আপনার জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠবে। তবে ১৬ তারিখের পর থেকে আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আপনি মানসিক শান্তি খুঁজে পাবেন। এতদিনকার কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃত মিলবে এ-সপ্তাহেই। ১৮-১৯ তারিখে অফিসে কাজের চাপ থাকবে। তবে ধৈর্য ধরে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন। প্রেমজ সম্পর্ক এক নতুন দিকে মোড় নেবে এবং অবশ্যই তা ইতিবাচক। ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় লেনদেন করার এটাই আদর্শ সময়। ২০-২১ তারিখে অর্থাৎ অন্তভাগে আপনার বহু কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসলেও অতিরিক্ত কাজের চাপে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহ: এই রাশির ব্যক্তিদের প্রথমেই বলব সপ্তাহর গোড়া থেকে মন শক্ত করে চলুন। কেননা আপনাকে অপমান করতে বিরোধীপক্ষ কোনও চেষ্টার খামতি রাখবে না। ১৬-১৮ তারিখে পরিস্থিতির কিছুটা বদল হবে। দূরভ্রমণের লক্ষ্য পূরণ হবে। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে এসময়ে সম্পত্তিলাভের যোগ দেখা যায়। অন্তভাগে মূলত ১৯-২০ তারিখের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনও দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ২১ তারিখে যেচে কারওর উপকার করতে যাবেন না, অহেতুক নিন্দা সইতে হবে।

কন্যা: জাতক-জাতিকার জন্য ১৫ তারিখ দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে খুশি হবেন। তবে ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টা খুব একটা শুভ বলা যাচ্ছে না। ১৬-১৭ তারিখের মধ্যে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা যায়। আপনার রাশির অষ্টম স্থানে চন্দ্রের পরিভ্রমণ আপনার পক্ষে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তবে পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, কিংবা শত্রুরা সক্রিয় হয়ে উঠুক, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও বাক্‌সংযম বজায় রাখুন। ১৯-২০ তারিখে কর্মক্ষেত্রে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন, যার জন্য পরবর্তীতে লাভবান হবেন। ২১ তারিখে বৃদ্ধি পাবে আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি।

তুলা: সপ্তাহের প্রথম দিনটি আপনাদের জন্য মিশ্র ফলদায়ক। ১৬ তারিখ দিনটি কর্মক্ষেত্রে বস আপনার কাজে অসন্তুষ্ট হবেন। পেটের রোগ, মাথার যন্ত্রণা এ-সপ্তাহে আপনাকে ভোগাবে। ১৭-১৮-এর মধ্যে বড় কোনও ডিল ফাইনাল করে নিতে পারেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তা পরে লাভজনক প্রমাণিত হবে। তবে কাজে খুব বেশি গতি আসবে না, এমনকী সমস্ত কাজ পরিকল্পনামাফিক না-ও এগোতে পারে। ২০ ও ২১ তারিখ মানে অন্তভাগের দিনদুটি জনসংযোগ বাড়ানোর উপযুক্ত সময়ে। এই যোগাযোগগুলি কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আপনার উন্নতি হবে।

বৃশ্চিক: বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহের শুরুটা অনুকূল। সম্পত্তি প্রাপ্তি হবে। সংগীত ও কলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। ১৬-১৭ তারিখের মধ্যে আর্থিক প্রবাহ ভালোই হবে। নতুন বাহন কেনার যোগ দেখা যায়। ১৯-২০ তারিখ দুপুর পর্যন্ত মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। কোনও সুখবরে মানসিকভাবে প্রসন্ন হবেন। তবে ২১ তারিখ দিনটি বারে বারেই বলব সাবধানে কাটাবেন। কোনও বৈবাহিক আয়োজনে আপনার মান-সম্মানে আঘাত লাগতে পারে।

ধনু: সপ্তাহের আদ্যভাগে যে কাজই করুন না কেন মন দিয়ে করুন, অন্যথায় সমস্যা হতে পারে। ১৬-১৭ তারিখে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জাতক-জাতিকাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। ১৮-২০ তারিখের মধ্যেকার সময়টা মিশ্র ফলদায়ক। সারা বছরের কাজের যাবতীয় পরিকল্পনা এসময়েই হয়ে যাবে। কঠোর পরিশ্রমে মনোমতো ফল মিলবে।

মকর: ১৫ এপ্রিল দিনটি ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ। একাধিক উপায়ে আয়ের যোগ রয়েছে। কোনও আত্মীয়ের উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হলেও তা বাইরে প্রকাশ করবেন না। তবে ১৬-১৭ তারিখের মধ্যে সাবধানে গাড়ি না চালালে দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। কেননা এসময়ে সূর্য, চন্দ্র ও শুক্র আপনার রাশির অষ্টম স্থানে আছে, তাই দুর্ঘটনার যোগ আছে। ১৮-২০ তারিখের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে আপনার বস ও সহকর্মীরা আপনার কাজের পদ্ধতির প্রশংসা করবেন। গত কয়েকমাস যাবৎ আটকে থাকা কাজের সমাধা এই সপ্তাহের অন্তভাগেই হয়ে যাবে। ২১ তারিখে দাম্পত্য সম্পর্কে আসবে মধুরতা।

কুম্ভ: জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহের আদ্যভাগটা অনুকূলই থাকছে। আপনার যোগ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে। ১৬-১৭ তারিখের মধ্যে সব কাজেই সফল হবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি কোনও নতুন পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন। নিজের যোগ্যতা যাতে সঠিক পথে পরিচালিত হয় মধ্যভাগে সেই বিষয়টার দিকে খেয়াল রাখুন। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল দিনদুটি মিশ্র ফলদায়ক। দীর্ঘ সময় ধরে করে আসা পরিকল্পনাগুলো সফল করার এটাই প্রকৃত সময়। ২১ তারিখে কোনও প্রিয়জনের সান্নিধ্য মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখবে। বাড়িতে কোনও নতুন বস্তু ক্রয়ের যোগ দেখা যায়।

মীন: সপ্তাহের শুরুটা জাতক-জাতিকার জন্য খুব একটা অনুকূল নয়। টাকা-পয়সা হাতে আসতে আসতেও আটকে যাবে। কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা নিকট আত্মীয়র সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রতীয়মান হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সময়টা মন্দ। নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিচালনা করে গেলেও এবং নিজের আদর্শ ও নীতির সঙ্গে চললেও কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন না। ২১ তারিখ সম্পত্তি-সংক্রান্ত ঝামেলা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় মিটে যাবে।

দ্রোণাচার্য

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: **বিপ্লব রায়** | সাপ্লি টিম: তন্ময় মণ্ডল, শর্মিলা চন্দ্র, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯ • ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com • সাপ্লি সংক্রান্ত যোগাযোগ: ০৩৩ ৪০৬০৫৮৩৭